আনন্দমেলা

২২ এপ্রিল ১৯৮৫ • আনন্দবাজার-প্রকাশনী
১.৫০

CAS/OPPL/3/80/BEN

আনন্দমেলা

৯ বৈশাখ ১৩৮৮ • ২২ এপ্রিল ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১ সংখ্যা

ভ্রমণকাহিনী
পৃথিবীর বৃহত্তম গহবর। শুভ্রেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ৪
গল্প
বজ্রপাতের পরে। বাণী বসু ১০
ব্যুমেরাং। মঞ্জিল সেন ৫১
ভয়। অনীশ দেব ৫৫
উপন্যাস
সিসের আঙটি। বিমল কর ১৬
হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৭
স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ২০
ছড়া ও কবিতা
বাঘা মামা। বিমল ঘোষ (মৌমাছি) ২৩
ছবি। মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু ২৭
তেরো-স্পর্শ। সুজিত সরকার ২৭
পথ-চাওয়া। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ৫৮
বহুদর্শী। শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় ৫৮
আমার স্বপ্ন। শমীন্দ্র ভৌমিক ৫৯
খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল। পি.কে. ২৪
চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবল ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪
খেলাধুলো
চেতনের দুর্ভাগ্য। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪২
ক্রাইস্টচার্চে ড্র। অলোক দাশগুপ্ত ৪৩
লম্বা বনাম বেঁটে। অশোক রায় ৪৫
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬২
বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬৩
অন্যান্য আকর্ষণ
ছোটদের ছবি ১৯, ছবির মজা ১৯
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, তোমাদের পাতা ৩৭
বিজ্ঞান-বিচিত্রা ৩৯, মণিমেলার খবর ৫৯
আঁকো-শেখো ৬৬
প্রচ্ছদ চিত্রজিৎ ঘোষ

সম্পাদক **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাণপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশন্‌স (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেট্টা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আনন্দমেলা
আগামী সংখ্যায়
কয়লাখনির জীবন নিয়ে
সুদেব রায়চৌধুরীর
তাক-লাগানো রচনা

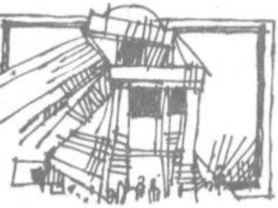

পাতালে পাঁচ ঘণ্টা

★

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

দাদুর দাঁদানো বাঁত

★

আরও অজস্র আকর্ষণ

পৃথিবীর বৃহত্তম গহ্বর

শুভ্রেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

কঠিন পাথর ও গভীর খাত

তোমরা তো জানো যে, কোটি কোটি বছর ধরে আমাদের এই পৃথিবী কত-না আলোড়ন, কত-না তোলপাড়ের মধ্যে দিয়ে আজকের এই সুশৃঙ্খল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এই আলোড়নের ধারা আজও স্তব্ধ হয়নি, সমানে পরিবর্তিত ভূ-প্রকৃতি গড়ে তুলছে, আবার ভাঙছে, আবার গড়ছে। তবে এটা দু-চার দিন কি দু-চার মাস কি দু-চার বছরের ব্যাপার নয়—প্রকৃতির এই ভাঙা-গড়ার খেলা কোটি কোটি বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস,

ক্যানিয়নের দক্ষিণ দিক

মানুষের জানার অগোচরে ধীরে ধীরে তা ঘটে যাচ্ছে। যেমন ধরো, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হচ্ছে, আবার দক্ষিণ-পূর্ব তটভূমি সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ক্রমশ, তেমনি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার স্থলভূমিও টাল খাচ্ছে, তার উত্তর দিকটা উঠছে, আবার দক্ষিণ দিকটা ডুবে যাচ্ছে। নেদারল্যাণ্ডস প্রতি একশো বছরে এক ইঞ্চি পরিমাণ করে জলের তলায় চলে যাচ্ছে!

পাঁজি কিংবা ক্যালেণ্ডারের পাতায় লেখা থাকে কবে কী হয়েছে তার সাল, তারিখ, নক্ষত্র ইত্যাদি। ভূ-প্রকৃতির এই অবিরাম তোলপাড়, ভাঙাগড়ার কাহিনীও তেমনি সাল-তারিখ ধরে যেন লেখা হয়ে আছে ধরিত্রীর এক বিশাল গহ্বরের শিলা-পঞ্জিকায়। উত্তর আমেরিকার কোলোরাডো নদীর অববাহিকায় প্রায় আঠারো মাইল চওড়া, দুশো সতেরো মাইল দীর্ঘ এবং এক মাইলের মতো গভীর যে গিরিখাত বা প্রাকৃতিক গহ্বরটি রয়েছে, যা দেখতে প্রতি বছর গড়ে বিশ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর সকল জায়গা থেকে এসে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন, তারই নাম গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন।

আরিজোনা রাজ্যের রাজধানী ফীনিকস শহর থেকে মাত্র দুজন যাত্রীবাহী "পাইপর" এরোপ্লেনে চেপে আমরা ঐ গহ্বরের ওপর দিয়ে উড়ে একটি ছোট্ট স্থানীয় বিমানবন্দরে এসে নামলাম। আশেপাশে দু-একটা হোটেল, খাবার জায়গা ইত্যাদি রয়েছে। দু-কামরা বিশিষ্ট হলদে রঙের কেব্‌ল-কার, অনেকটা কলকাতার ট্রাম-গাড়ির মতো, স্থানীয় পরিবহণের কাজ করছে। আমরা অবশ্য হেঁটেই গেলাম গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের পাড় পর্যন্ত, যেখানে লোহার রেলিং দিয়ে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু লোকই দেখলাম দু চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে গিরিখাতটির দিকে, মুখে অনেকেরই কথা সরছে না, কেউ-বা বলে ফেলছে "টেরিফিক"!

অনেকে আবার দেখলাম পাকদণ্ডী গিরিপথ বেয়ে বনজঙ্গল ভেঙে নেমে যাচ্ছে। ট্রেকিং-এর নেশা বড় সাংঘাতিক, একটি মার্কিন মেয়ে ও তার দুই তরুণ বন্ধু ঠিক তক্ষুনি হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে

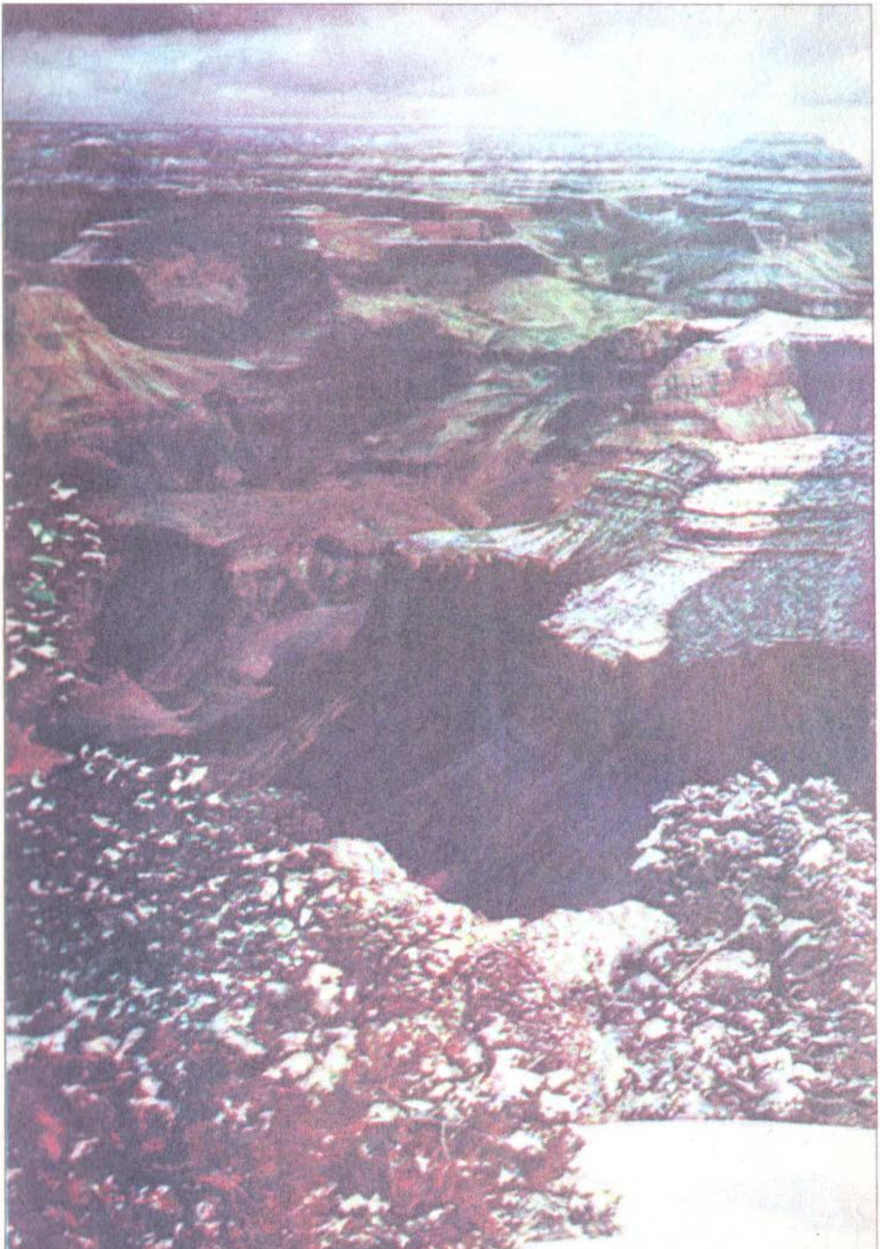

আসছিল। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, "নীচে কী দেখলেন?" একজন পশ্চিম আমেরিকার কথা বলার বিশেষ ঢঙে বললেন—
Oh! you bet.....it's terrific! We tried to find out the missing link —but it's so hot down there.

"মিসিং লিংক্", হারানো সূত্র—ভারী অবাক লাগল লোকটির কথা শুনে। পায়ে পায়ে আমরা ক্যানিয়নের পাড় বরাবর গিয়ে দাঁড়ালাম। দু চোখ মেলে তাকালাম প্রকৃতির সেই আশ্চর্য গহ্বরটির দিকে। সোনা রোদে চারিদিক ঝলমল করছে, তবু যেন গহ্বরের মধ্যে কুয়াশার নীল আস্তরণ। দেখলাম, নীচে থেকে থাক-থাক হয়ে কত বিচিত্র স্তর একের পর এক উঠে এসেছে। ভূত্বকের এই চেহারা তো সচরাচর দেখা যায় না। ক্যানিয়নের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় দেখেছি প্রকৃতির এই বিশাল হাঁ। ভয়ঙ্কর অথচ আশ্চর্য স্তব্ধতায় যেন ঘুমিয়ে রয়েছে, শুধু কোলোরাডো নদী তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে নিরন্তর। প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয়ীভূত এই সব শিখরগাত্রগুলি যেন দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের গায়ের কারুকার্যের মতো, কত বিচিত্র রঙ, কত ধরন।

গহ্বরের এই ভয়ঙ্কর সুন্দর চেহারা থেকে মনকে যদি ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে আরও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার নজরে আসবে। ভগবান যখন আপন খেয়ালে প্রকৃতির রূপ দিয়ে যাচ্ছেন, তখন বুঝি এমনি করেই স্তরীভূত পাথরের গায়ে লিখে রেখে যাচ্ছিলেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের পর্যায়-ক্রমিক ইতিহাস। ভাবটা এই যে, হে অনাগত যুগের মানুষ, তুমি কখনও যদি সৃষ্টির গোড়ার কথা জানতে আগ্রহী হও তো তোমার জন্যে লিখে রেখে গেলাম এই শিলাগাত্রের দিনপঞ্জী, সম্ভব হলে পড়ে নিয়ে কৌতূহল মিটিও, আর হ্যাঁ, সেই সঙ্গে জ্ঞান অর্জনও করো। চলো না, আমরাও সেই প্রকৃতির পাঠশালায় স্রষ্টার আপন হাতের পাঠ গ্রহণ করি।

এই পাঠই হল সেই "মিসিং লিংক" খুঁজে পাবার বর্ণপরিচয়। এই বিস্ময়-গহ্বর কেমন করে হল তারই অন্বেষণ। এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সৃষ্টি হতে মাত্র কয়েক লক্ষ দশক লেগেছিল। আমাদের দৈনন্দিন হিসেবের তুলনায় এই দশ লক্ষ বছর হয়তো বিরাট বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু পৃথিবী নামক এই গ্রহের সাড়ে চার হাজার কোটি বছরের জীবনের হিসেবে তা সামান্য মুহূর্ত মাত্র, নয় কি? ক্যানিয়নের পাড় থেকে কোলোরাডো নদী অবধি শিলাস্তরের থাকে-থাকে সেই সামান্য সময়েরই একটি বিশ্বস্ত অতীত ইতিবৃত্ত আজকের ভূ-বিজ্ঞানীদের জন্য বিধৃত আছে।

যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলের ভূত্বক বহু আশ্চর্য পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা ক্যানিয়নের এই সব শিলা-স্তরগুলি পুরানো ডায়েরি পড়ার মতো করে সতেরোশো কোটি বছর পিছনের খবর জানতে চেষ্টা করেছেন। কারণ অতীতের সময়-নির্ধারণের তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির দ্বারা প্রাচীনতম অনাবৃত শিলার বয়স ১-৭ বিলিয়ন বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে কি না। তাঁরা দেখেছেন যে, এই গহ্বরটি সৃষ্টি হবার আগে অন্তত দু-দুবার পর্বত গঠন, ক্ষয় ও চ্যুতি ইত্যাদির ব্যাপক আলোড়ন চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে এই এলাকায়। এই গিরিখাতটির জন্মের পূর্বে অন্তত আরও দুবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূ-পৃষ্ঠের তোলপাড় উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশকে পার্বত্য মালভূমিতে পরিণত করেছিল। তারপর মৃত্তিকা ক্ষয়ে ক্ষয়ে সমতলভূমি দেখা দিতে লাগল। আরও দু-বার এই অঞ্চল সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল, তারপর সমুদ্রতল ঠেলে যখন পর্বত-গঠন শুরু হল প্রকৃতির খেয়ালে, তখন জল সরে চড়া জেগে উঠল, যার সর্বাঙ্গে ঘনভাবে আবৃত ছিল সামুদ্রিক কর্দম, আর তার ওপর ফুটে উঠেছিল উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের জীবাশ্মের নীরব কাহিনী।

আজকের কোলোরাডো মালভূমি এইরকম তোলপাড়ের তৃতীয় কোনো পর্যায়ে গঠিত হয়েছিল, প্রথমে খুবই ধীরে-ধীরে, তারপর কয়েক লক্ষ দশক ধরে একটু তাড়াতাড়ি। আঁকাবাঁকা নদী সেই নব-গঠিত পাললিক শিলাস্তরকে বিদীর্ণ করে খরস্রোতা হয়ে নীচে নামতে থাকে। ধীরে-ধীরে খোদাই-করা মন্দিরগাত্রের মতো নকশার কাজ দেখা যেতে থাকে সেই গিরিখাতের দেওয়ালে, যা

নাকি আজ আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি। কোলোরাডো নদী চওড়ায় গড়ে তিনশো ফুট, কিন্তু এই গিরিখাতের কিছু অংশ তৈরি করেছে এই নদী। বাকি কাজটুকু করেছে নদীর শাখা-প্রশাখাগুলি। গড়ে উঠেছে আঠারো মাইলের বিশাল এক গহ্বর। ক্ষয়ে-যাওয়া বা ভেঙে-পড়া পাথরের টুকরো, বালি ও মাটি আজও কোলোরাডো নদী তার লালচে-হলুদ স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরের দিকে।

ভূত্বক কী দিয়ে গঠিত হয় জানো? বিভিন্ন শিলাস্তর দিয়ে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের গায়ে বারোটি মুখ্য স্তর দেখতে পাওয়া যায়। তাদের কোনোটা লাল, কোনোটা ধূসর, কোনোটার রঙ পোড়ামাটির। এইসব স্তরের এক-একটি এত সুবিন্যস্ত যে, তাদের কৃত্রিম বলে মনে হয়। এই স্তরগুলি প্রাচীন সমুদ্রের বারিরাশির বুকে জেগে ওঠা পাললিক মৃত্তিকার দ্বারা সৃষ্ট। একটা উদাহরণ দিই। একটা গেলাসের মধ্যে খানিকটা কাদাগোলা জল রেখে দিলে দেখবে, ভারী কাদার অংশ গেলাসের তলায় ধীরে ধীরে থিতিয়ে গিয়ে জমে যাচ্ছে। ওপরের জল পরিষ্কার। সমুদ্রের বেলাতেও ঠিক এমনি ঘটেছে, অর্থাৎ যত নদী সমুদ্রে এসে মেশে, তারা সবাই বয়ে আনে কাদা আর বালির বিরাট একটা অংশ। পরে সেগুলো জমে জমে ঘন স্তরের মতো হতে থাকে। সমুদ্রের যে-সব অংশ বেশি গভীর সেই সব জায়গায় মাছের কঙ্কাল, কিংবা ছোট-ছোট সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস বা ঝিনুক জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত সিন্ধুকর্দমের সঙ্গে মিশে যায় এবং নতুন ধরনের স্তর রচনা করে। এই স্তর-গুলির ওপর পড়ে লক্ষ-কোটি বছরের সমুদ্রজলের প্রচন্ড চাপ। ফলে এগুলি শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই তো অসংখ্য বালুকণা জুড়ে জুড়ে তৈরি হয় বেলেপাথর বা স্যান্ডস্টোন, আগেকার কাদা পরবর্তীকালে হয় শেল, আবার ঝিনুক-জাতীয় পদার্থ ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুন জাতীয় দ্রব্যাদি একত্রে মিশে তৈরি হয় চুনাপাথর বা লাইমস্টোন।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের শিলাস্তরগুলি প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চল, যা নাকি এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দেড মাইল উঁচু, তা একদিন সমুদ্রের গভীরে ডুবে ছিল। একবার দুবার নয়, বারবার। কখনও নদী বয়ে এনেছে লাল মৃত্তিকা। কখনও সমুদ্র ছিল গভীর, তাই চুনাপাথর সৃষ্টি হয়েছে। কখনও এটা

ছিল কোনো নদীর মোহনা, তাই বালিয়াড়ি আর বেলেপাথরের সৃষ্টি।

ক্যানিয়নের গভীরতম স্তরে, যেখানে কোলোরাডো নদী ইংরেজি ভি অক্ষরের আকারে গিরিখাত কেটে চলেছে অবিরাম,

নদীর উপরে ঝুলন্ত সেতু

সেখানে নজর করলে আমরা দেখব যে, সেখানকার শিলাস্তর কৃষ্ণবর্ণ এবং গঠন-বৈচিত্র্যে অন্য সব স্তরের চেয়ে যেন আলাদা। কারণ এটাই হল প্রাচীনতম সিন্ধুকর্দমের স্তর, ভূবিজ্ঞানীরা যাকে বলে থাকেন ভিত্তিস্তর বা বেসমেন্ট।

এই ভিত্তিস্তরের ওপরই নতুন-নতুন শিলাস্তর গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্তর তৈরি হবার সময় তার নীচের স্তরটি তৈরি হয়েই ছিল আগে থেকে, তাই নীচেরটি প্রাচীন ওপরেরটি অর্বাচীন। সেইজন্যেই তো বলছিলাম যে, এই স্তরের পর স্তর যেন একের পর এক ক্যালেন্ডারের পাতা. ক্যানিয়নের গা-বেয়ে যতই নীচে নামা যাবে, ততই যেন একের পর এক দরজা পেরিয়ে অতীতের পানে এগিয়ে যাওয়া হবে। যে-সময়ের শিলাস্তর, তার গায়ে গেঁথে আছে সেই সময়ের জীবনের ইঙ্গিত, তবে তা

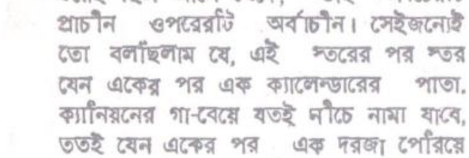

ক্যানিয়ন, অন্য দিক থেকে

সামুদ্রিক জীবনেরই সন্ধান দেবে বেশি, যতটা না দেবে উদ্ভিদ পোকামাকড় ইত্যাদির পরিচয়। লক্ষ লক্ষ বছরের জলের চাপে সেগুলি সবই প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে, তাদের জৈব পদার্থ ক্রমশ একটি একটি কোষ করে খনিজ পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে দেখবে, যার নাম জীবাশ্ম বা ফসিল।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এই পৃথিবী নামক গ্রহে জীবনের সচিত্র ইতিহাস। একেবারে নীচে ভিত্তিশিলায় জীবনের কোনো সন্ধান মেলে না, তাহলে সেযুগে কি জীবনের অস্তিত্ব ছিল না? নাকি তার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে? সব প্রশ্নের উত্তরই যে মিলবে এমন কথা নেই।

এর ওপরের স্তরে বিজ্ঞানীরা অ্যালজি নামক প্রথম প্রাণের সন্ধান পান। পুকুরের স্থির জলে অনেক সময় সবুজ রঙের শ্যাওলা-জাতীয় একরকম জিনিস দেখা যায়, তার কিছুটা এই অ্যালজি-গোত্রের। পৃথিবীর পরবর্তী নাগরিকদের সন্ধান মেলে তার ওপরের স্তরে, এরা হল ট্রিলোবাইট। এরপর আসে আঁশবিহীন খোলা-বিশিষ্ট এক ধরনের মাছ। এবার কিন্তু সমস্ত ক্যানিয়ন জুড়ে দিনপঞ্জীর পাতায় নামে অনেক কালের শূন্যতা.........লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জীবনের আর কোনো হিসেব মেলে না।

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা যখন আবার খুঁজে পাওয়া যায়, তখন বিরাট একটা কিছু ঘটে গেছে......সমুদ্র ছেড়ে জীবনের ধারা ডাঙায় উঠে এসেছে। প্রাণীরা এখন শিখেছে কেমন করে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয় বাতাসের মধ্যে, তবে তখনও তারা গির-গিটি জাতীয় উভচর শ্রেণীর। পাললিক কর্দমের ওপর দিয়ে এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীটি তার লেজ টেনে টেনে যে দাগ কেটে গেছে তারই সন্ধান এবার পাওয়া গেল। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কাহিনী এখানেই থেমে গেছে, কারণ একেবারে ওপরের স্তরটিও তো বহু সুপ্রাচীন।

এ তো গেল ক্যানিয়নের কাহিনী, বিজ্ঞানীদের কাছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে এর প্রাকৃতিক দৃশ্য অবাক হবার মতোই। এ-দৃশ্যের অবতারণা হল কেমন করে?

একজন কৃষক একবার বলেছিল, "ও

হো! কত বড় ফাটল রে বাবা!" ফাটলই বটে, আবহবিকারের ফলে সৃষ্ট, কিন্তু তফাত আছে একটা। ক্ষয়ে যাওয়া ভূমিতলের ওপর দিয়ে ওই ফাটল বেয়ে খরস্রোতা শীর্ণ নদীর সৃষ্টি হয়, এবং তা নিজেই নিজের গতিপথ খনন করতে করতে পাতাল-পানে গভীর খাত তৈরি করে ফেলে। এখানে এই কোলোরাডো মালভূমির মধ্যে নদী একটা ছিলই, শুধু দুপাশের জমি উঁচু থেকে ক্রমশ আরও উঁচু হয়ে উঠেছিল। তফাত এইখানেই।

জন ওয়েসলি পাওয়েল ছিলেন একজন প্রাক্তন মার্কিন সেনাধ্যক্ষ। ইনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আবিষ্কার করেন এবং এর গঠনপ্রণালীর নীরব কাহিনী পাঠ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি নৌকো চড়ে ক্যানিয়নের গিরিখাত দিয়ে ঘুরে আসেন। আবার যান পরের বছর। সে যাত্রায় তিনি প্রায় ডুবতে ডুবতে একেবারে মৃত্যুর কাছাকাছি পেঁছেও ক্যানিয়নের গায়ের পাথুরে ধাঁধার সমাধান করেছিলেন। ধাঁধাটি ছিল এইরকম—"এই বিরাট ফাটলের শিলাচিত্রটির মধ্যে কী ভুল আছে বার করো।" নদীর গতিপথ এখানে তার অববাহিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গেছে, এটা কেমন করে হয়? কোলোরাডো মালভূমি আসলে সমতল, একটা বিশালাকার গম্বুজের চ্যাপটা মাথার মতো। আশেপাশের জমি থেকে হাজার-হাজার ফুট ঠেলে-ওঠা পাহাড়-সদৃশ এক সমতল উচ্চভূমি। নদীটি এসেছে উত্তর দিক থেকে শীর্ণ খাত বেয়ে, সমানে এই উচ্চভূমি বরাবর বয়ে গেছে, এবং তারপর নীচে গিয়ে পড়েছে বহুদূরে। আসলে এর উচিত ছিল উঁচু মালভূমি অঞ্চলকে ঘিরে বয়ে যাওয়া, কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি? পাওয়েলের সমাধান হচ্ছে যে, এখানকার সমস্তই যখন নিম্নভূমি ছিল, নদী তখন থেকেই এখানে আছে। পরবর্তীকালে আশপাশের জমি উঁচু হয়ে উঠেছে নদীখাতের দুধারে... আর নদী তার স্বাভাবিক বেগে চলার পথ আরও গভীর থেকে গভীরতর করে কেটে গেছে সমানে।

আমরা সেদিন রাত্তির বেলা ক্যানিয়নের বিশাল গ্র্যানিট গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে নদীর কাজের আওয়াজ কান পেতে শুনেছিলাম। অদ্ভুত সে শব্দ। নদীর স্রোতে বাহিত শিলাখন্ড, নুড়ি, কাঁকর ইত্যাদি যা নাকি নদীর হাতিয়ার, সেইগুলিই নদীতল দিয়ে সবেগে বাহিত হচ্ছে বুঝলাম, আর এও বুঝলাম যে, নদীর গর্ত কাটার কাজ আজও চলেছে আগের মতোই। কী বিরাট সময়ই না লেগেছে এই কাজে, তবু তিল তিল করে জমে ওঠা ঐ পাললিক শিলাস্তর গঠনের সময়ের তুলনায় এই গহ্বর কাটার কাজ তো অনেক দ্রুত, তাই নয় কি?

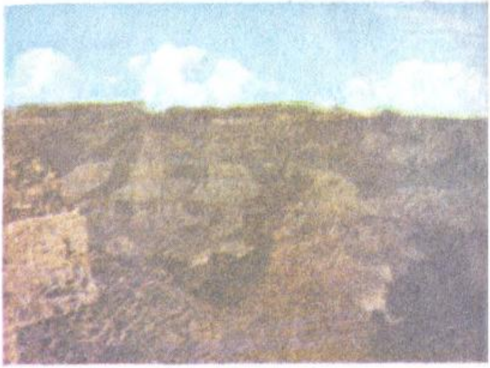
পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সামনে দাঁড়ালে তার বিশালতার কাছে মাথা নত হয়ে আসে, যেমন হয় হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে। মনে হয় প্রকৃতির হাতে কী অফুরন্ত সময়, যা নিয়ে তিনি এই বিরাটের সৃষ্টি করেছেন, অথচ এই সময়ই আমাদের হাতে একেবারে নেই—কাল ভোরেই ফিরতে হবে ফীনিকস শহরে।

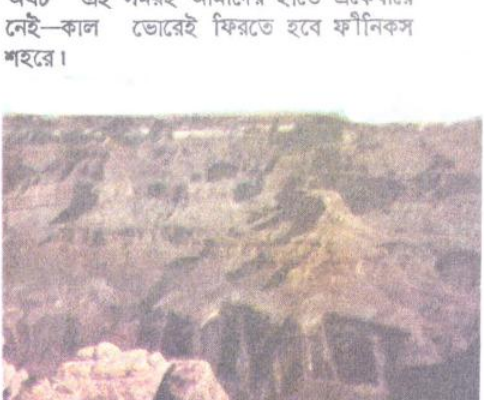
নদী যেভাবে ভূমিক্ষয় করেছে

বজ্রপাতের পরে

বাণী বসু

শম্পি বসে আছে তার ছোট্ট খেলাঘরে। তার সামনে, দু-পাশে-চাকা-লাগানো টেবিল। টেবিলের ওপর খেলনা ছড়ানো। পুতুলের সোফা-সেটি, খাট, আলমারি, আয়না-লাগানো ড্রেসিং টেবিল। চেয়ার, ছোট-ছোট-অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি-কড়া, হাতা-খুন্তি। খুকু-পুতুল—টেবো-টেবো গাল; খোকা-পুতুল—ঝাঁকড়াচুলো; বৌ-পুতুল—ঘোমটা-দেওয়া সলমা-চুমকির শাড়ি পরা; মেম-পুতুল—ঘাগরা পরা, হাতে পাখা; ঘাড়নাড়া বুড়ো-পুতুল। আর কত বলব? টেডি বেয়ার, কাঠের ঘোড়া, কৃষ্ণনগরের মাটির ফল, প্লাস্টিসিনের তাল। তাই দিয়ে অন্য সময় শম্পি অনেক কিছু বানায়। মেকানো সেট আছে, আধখানা ক্রেন বানিয়ে ফেলে রেখে দিয়েছে শম্পি। আজ তার মন খারাপ। রবিবার। কিন্তু মা বাড়ি থাকবে না। বাবা বাড়ি থাকবে না। শ্যামবাজারের দাদুর ভীষণ অসুখ। মা-বাবাকে যেতেই হবে। এবং শম্পিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। একে তো ছোট ছেলে-মেয়েদের অসুখের বাড়ি যেতেই নেই। তার ওপর...

তার ওপর শম্পি যে হাঁটতে পারে না! সেই ছোট্টবেলায় তিন-চার বছর বয়সে শম্পি কত দৌড়ঝাঁপ করত, বাগানময় ছাদময়। তারপর হঠাৎ একদিন তার খুব অসুখ করল। ভীষণ জ্বর, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। ডাক্তারবাবু অনেক ইঞ্জেকশন দিলেন, অসুখ সেরে গেল। কিন্তু সেই থেকে শম্পি হাঁটতে পারে না। এখন তার প্রায় আট বছর বয়স। লম্বা-লম্বা সুন্দর পা দুটো। কেউ দেখলে বুঝতেও পারবে না সে হাঁটতে পারে না। কিন্তু কথাটা সত্যি। ডাক্তারবাবু একদিন অন্তর পায়ে কী সুন্দর ম্যাসাজ করে দিয়ে যান। মাঝে-মাঝে ক্লিনিকে গিয়ে কতরকম যন্ত্র দিয়ে কত কী করা হয়। কিন্তু শম্পি হাঁটতে পারে না। তার জন্য চাকা-লাগানো হুইল-চেয়ার আছে, বাড়ির কোনও ঘরে চৌকাঠ রাখা হয়নি, বাগানে যাবার সিঁড়ি ভেঙে ঢালু করে দেওয়া হয়েছে, যাতে চেয়ার গড়গড়িয়ে চলতে পারে।

মা ঘরে এলেন, হাতে পায়েসের বাটি। বাগান থেকে সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। গুলঞ্চ গাছটার ওপর ল্যাজঝোলা পুঁচকে কালো পাখিটা তিড়িং-তিড়িং করে নাচছে। ঘরের মধ্যে গঙ্গাফড়িং। শম্পি মুখ ফিরিয়ে রইল।

মা বললেন, "লক্ষ্মী হয়ে খেয়ে নাও মা। আজ কি অমন করতে আছে?" মায়ের পরনে সাদা শাড়ি, চোখের কোলে জলের দাগ। বেরোবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছেন। বাবা ট্যাকসি আনলেই চলে যাবেন। শম্পি বাটিটা হাতে নিল। অমনি বাগানের দিকের জানলার ফ্রেমে একটা ভীষণ দুষ্টু-দুষ্টু মুখ দেখা গেল।

মা বললেন, "ওই তো, ডাকুদাদা এসে গেছে। ডাকু, আয়। পায়েস খাবি। শম্পির সঙ্গে খেলা করবি। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। ততক্ষণ, লক্ষ্মীমানিক, শম্পির সঙ্গে খেলা করো তো! কিছু দরকার হলেই রেণুদিদি আছে। বলবি। আর শোন্, আকাশ ভাল না, বাগানে-টাগানে যাসনি যেন।"

ডাকু লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল।

মা বাবা অনেকক্ষণ হল বেরিয়ে গেছেন। রেণুদি খবরদারি করবার জন্য খানিকটা বসে ছিল। এখন কাজেকর্মে, কিম্বা বোধহয় আড্ডা দিতে বেপাত্তা হয়ে গেছে। আজ ডাকুদাদা একটা দারুণ বই এনেছে। চিলড্রেনস পিকচার অ্যাটলাস। কিন্তু ভেতরে মোটেই শুধু হিজিবিজি ম্যাপ নেই। আছে দারুণ-দারুণ ছবি। নীল হ্রদের মধ্যে সাদা-লাল পালের নৌকো, চারদিকে বরফে-ঢাকা পাহাড়ের চুড়ো। ঘাসের মধ্যে ঝিকমিকে ডেইজি ফুলের মেলা, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে খেলছে, গায়ে রঙিন-রঙিন সোয়েটার, মুখে ঝলমলে হাসি। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নীল সমুদ্র এঁকেবেঁকে ঢুকে পড়েছে।

ডাকুদাদা বলল, "এই দ্যাখ, নরওয়ের ফিওর্ড। স্কটল্যান্ডের পাহাড় সবুজে সবুজ। সাদা-সাদা অসংখ্য ভেড়ার পাল চরছে। পেছনে পশমের টুপি পরা ভিনদেশী রাখাল, কানঝোলা শীপ-ডগ। বিরাট-বিরাট শহর, কী সব নাম! কোপেনহেগেন, স্টকহোম, স্টালিনগ্রাড, রটারডাম, আমস্টারডাম। প্রকান্ড উঁচু বাড়ি, রাস্তা দিয়ে সারি-সারি গাড়ি চলেছে! ডেনমার্কের ছবিতে সমুদ্রের ওপর পাথরের চাঁই, তার ওপর মুখ নিচু করে

লিনটাস- ৮. ৪০-1812 ৮৬

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বসে আছে মারমেইড, জলকন্যা।"

ডাকু আবার বলল, "এই দ্যাখ, তোকে যে-জলকন্যার গল্পটা বলেছিলুম, যে মানুষ হতে চেয়েছিল কিন্তু জলের বুদ্বুদ হয়ে গেল, সেই মেয়েটাকে ওরা পাথর দিয়ে গড়ে বসিয়ে রেখেছে। মানুষ হতে চেয়েছিল তো, তাই মানুষরা ওকে ভালবাসে। জোছনা রাতে জলকন্যার চোখ দিয়ে জল পড়ে, জানিস তো?"

শম্পি বলল, "যাঃ। পাথরের পরীর আবার চোখ দিয়ে জল পড়তে পারে নাকি?"

"তুই জানবি কী?" ডাকু বলল, "কুঁড়ের ধাড়ি একটা, খালি বসে থাকিস। ধেড়ে মেয়ে বাবার কোলে চাপিস। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।"

শম্পি বলল, "ভ্যাট্। ও তো অনেক দূরের দেশ! কী করে যাবি? জাহাজে কিম্বা এরোপ্লেনে যেতে হয়। আমি জানি না বুঝি?"

ডাকু বলল, "যাওয়া যায় না বললেই হল? আমি যদি তোকে নিয়ে যেতে পারি? হুলং গেছি, মিরিখ গেছি, আমস্টারডাম সুইজারল্যান্ড, সাইবেরিয়া, কাস্পিয়ান সাগর সব দেখেছি, তা জানিস?"

শম্পির চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেল। আর 'যাঃ' বলতে পারল না। ডাকুদাদার চোখের তারায় সে আমস্টারডামের উঁচু-উঁচু বাড়ি, সুইজারল্যান্ডের নীল হ্রদ, মাইলের পর মাইল ধু ধু বরফের মাঠ, সব স—ব দেখতে পাচ্ছে।

ডাকু বলল, "চল্, বাগানে চল্, দেশ-ভ্রমণের গল্পগুলো সব তোকে বলব। ওঠ্, ওঠ্ বলছি।"

শম্পি বলল, "আমি যে উঠতে পারি না ডাকুদাদা।"

"উঠতে পারিস না, না হাতি। লম্বা লম্বা ঠ্যাং, তবু নাকি উঠতে পারে না! দুষ্টু পাজি ব্যাঙ কোথাকার! আচ্ছা চল্, তোর গাড়ি ঠেলে বাগানে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর দেখা যাবে।" বলেই গড়গড় করে ভীষণ জোরে চেয়ার ঠেলে দেখতে-দেখতে তাকে বাগানে হাজির করে ফেলল ডাকু।

জোড়া নিমগাছটার তলায় খুব ছায়া। ডালপালা ছড়িয়ে গাছটা অনেক দূর পর্যন্ত রোদ আড়াল করে রেখেছে, যদিও আজ রোদ নেই বললেই হয়। ডালে-ডালে কাকের বাসা, মৌচাক দুলছে। ওরা পৌঁছতেই তিনটে কাঠ-বিড়ালি তিনদিক দিয়ে পালিয়ে গেল।

ডাকু বলল, "এই দ্যাখ এয়ারপোর্ট। এখানটাকে বলে রানওয়ে। এখান থেকেই আমাদের প্লেন ছাড়বে। মালপত্র সামলে নিয়ে বোস।"

শম্পির কোলে অ্যাটলাসটা ঝুপ করে ফেলে দিল ডাকু।

"এক্ষুনি প্লেন এসে যাবে, তখন কোমরে বেল্ট বেঁধে লেবেঞ্চুস মুখে নিয়ে ওঁ-ওঁ করে যেতে হবে। দেখিস লেবেঞ্চুসটা আবার চিবিয়ে ফেলিসনি যেন। মুখে রেখে দিবি, না হলে কানে তালা লেগে যাবে।"

এমন সময়ে পাশের বাড়ি থেকে ডাকুর পিসির গলা ভেসে এল "ডাকু-উ-উ-উ।"

অনেকক্ষণ সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে ডাকুদাদা। কিন্তু পিসির গলা ক্রমশই চড়ছে। রাগী-রাগী হয়ে যাচ্ছে।

ডাকু বলল, "তুই চুপটি করে বোস শম্পি, আমি চট করে শুনেই আসছি। অ্যানাউন্স করবে দেখবি বোয়িং সেভেন ও সেভেন। ঘাবড়াসনি। প্লেন তাড়া দিলে বলবি, মাস্টার ডাকুই আভি নেই আয়া হ্যায়। ব্যস, থেমে থাকবে।"

ডাকুদাদা গেছে তো গেছেই। আকাশ আস্তে-আস্তে কালো হয়ে আসছে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। কোলের ওপর ভারী মোটাসোটা অ্যাটলাস। শম্পির চোখ আটকে আছে জলপরীর পাতায়। সমুদ্র...পাথর... টুনিমাসির বন্ধুর মেয়ে...কী যেন নাম? মনালি না মানালিদিদি? বর্ধমানে থাকে? তার মতো দেখতে জলপরীটাকে। আহা...ও মানুষ হতে চেয়েছিল...অনেক কষ্ট করে দুখানা পা পেয়েছিল...তারপরে? তারপরে কী হল?...চাঁদনি রাতে সত্যিই কি জল-কন্যের চোখ দিয়ে জল পড়ে নাকি? ডাকু দাদাটা যত স...ব...মি...থ্যো...ক...থা...

বই দেখতে-দেখতে খেয়ালই ছিল না শম্পির। হঠাৎ জোঁ-ওঁ-ও শব্দে চমকে মুখ তুলে দেখে একটা ছোট্ট সাদা রঙের প্লেন যেন হাঁসের মতো পাখা ছড়িয়ে নেমে আসছে। শম্পির অবাক চোখের সামনে দিয়ে প্লেনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডাকুদাদা। এখন আর নোংরা না। ফিটফাট। চুল আঁচড়ানো।

লাল-কালো জমকালো ডিসকো শার্ট পরে আছে। চকচকে বকলস দেওয়া জুতো। নীল জীন্স। ভীষণ স্মার্ট। একলাফে দরজা থেকে নেমে পড়ল ডাকুদাদা।

"হ্যাল্লো শম্পি, এসে গেছি। ভেবে দেখলাম আমার এই টু-সীটারটাই ভাল। দুজনে মিলে গল্প করতে-করতে যাওয়া যাবে। চল্।"

টেনে হিঁচড়ে হুইল-চেয়ার থেকে তাকে নামিয়ে দিল ডাকু। তারপর টানতে-টানতে প্লেনের দরজা খুলে সীটে বসিয়ে দিল।

শম্পি ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগল, "আমার চেয়ার! আমার চেয়ার! লক্ষ্মীটি, আমার চেয়ারটা এনে দাও।"

ডাকু বড়দের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তোকে নিয়ে আর পারা যায় না! আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, এই নে তোর চেয়ার।"

ঠেলেঠুলে চেয়ারটাকে প্লেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ডাকু। তারপর কখন দুজনে আকাশে উঠে পড়েছে, শম্পি জানেও না।

আপনা থেকে চলেছে প্লেনটা। মাঝে-মাঝে খালি মোড় ঘোরাবার জন্য বোতাম টিপে দিতে হচ্ছে। ডাকু বলল, "দেখিসনি গতবছর ছোটমামা এই প্লেনটা আমায় হিউস্টন থেকে এনে দিয়েছিল! অটোমেটিক। আপনি আপনি চলে। খালি বোতাম টেপো, লাল, হলদে, সবুজ।"

শম্পি বলল, "সেটা তো ছোট প্লেন ডাকুদাদা, আমার ডলপুতুলগুলো চড়তে পারে। আমরা কী করে চড়লাম?"

ডাকু বলল, "তোকে নিয়ে আর পারি না। তুই দু বছর আগে যা ছিলি, এখনও তাই আছিস? আমার ছমাস আগেকার জামাজুতো সব রিনটিনকে দিয়ে দিতে হয়েছে, তা জানিস? প্লেনটা আরবছর যা ছিল, এ-বছরও তা-ই থাকবে? তোর যা বুদ্ধি! স্কুলে-টুলে যাস না তো, কিস্যুই জানিস না। দেখিস না, আর পাঁচ বছর পরে এটাই বোয়িং হয়ে যাবে, তখন বাবাকে বলে আরও সীট তৈরি করিয়ে নিতে হবে।"

অনেক নীচে যেন সাদা তুলোর মাঠ। শম্পি বলল, "সাইবেরিয়া না কি রে?"

ডাকু বলল, "দূর, ও তো মেঘ। আমরা এখন মেঘের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। একটু পরেই দেখবি এয়ারপোর্ট এসে গেছে। তখন সবুজ বোতাম টিপে নামতে হবে। তবে আমাদের অবশ্য কোনও বাড়ির ছাদে নামলেও চলবে।"

শম্পি বলল, "কী মজা! বাড়ির ছাদেই নামবে চলো ডাকুদাদা।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই চৌকো-চৌকো বাক্সের মতো সব বাড়ির ছাদ দেখা যেতে লাগল। প্লেন শোঁ-শোঁ করে নীচে নামতে লাগল। ডাকু মিনিবাসের কনডাক্টরের কায়দায় হেঁকে উঠল, "কোপেন হেগেন, কোপেন হেগেন।"

যে বাড়ির ছাদে ওরা নামল, সেটা একটা ছোটখাটো মাঠের মতোই। প্লেন থেকে নেমেই চেয়ারে চড়ে বসল শম্পি। ডাকু বকতে বকতে তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। "মা-বাবার আদর বেশি-বেশি খাবার জন্য খোঁড়া সেজে থাকিস। কুঁড়ে। ভেবেছিলুম বিদেশে এসে হাঁটবি..."

ছাদ থেকে বেরিয়েই লিফট। কোনও মানুষ নেই। বোতাম টিপে দিতেই শোঁ-শোঁ করে নেমে চলল লিফট। একেবারে এক-তলায়। ডাকু বলল, "কখন পায়েস খেয়েছি! পেট চুঁই-চুঁই করছে। চল্, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।"

একটা বিশাল ঘরে ঢুকল দুজনে। কেমন পড়ন্ত বিকেলবেলার মতো আলো ঘরটাতে। সারি-সারি চেয়ার টেবিল পাতা। কোথাও কেউ নেই। খালি খুব সাদাচুল, ধবধবে বরফের মতো ফর্সা একজন মেমবুড়ি সাদা উলের শাল বুনে চলেছেন একমনে। শম্পি ভাবল, ইনি কি সাহেব-মেমদের চাঁদের মা বুড়ি।

ডাকুদের কিছু বলতে হল না। ওদের দেখেই তিনি আগে দুটো সুন্দর-সুন্দর ফারের কোট পরিয়ে দিলেন দুজনকে। তারপর মাঝখানের টেবিলটাতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একের পর এক খাবার আসতে লাগল। কত রকম বাটিতে, কত রকম প্লেটে। আচারের মতো, চকোলেট-পুডিং-এর মতো, নাম জানে না শম্পি। খালি মুখের ভেতরটা আহ্লাদে গলে জল হয়ে যেতে লাগল, এত ভাল!

শম্পি বলল, "সমুদ্দুরে যাবে না ডাকু-দাদা? আমি কখনও সমুদ্দুর দেখিনি।"

ডাকু হেসে বলল, "দেখাব বলেই তো এনেছি। আর কী দেখাব বল তো?"

শম্পির চোখ জ্বলজ্বল করছে, বলল "এইখানেই নাকি?"

ডাকু বলল, "নিশ্চয়ই। তুই এত ভুলে যাস কেন বল্ তো? এখানেই তো তোর সেই পাথরের জলপরী। দেখবি কেমন রাত্তিরবেলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।"

পরীর কান্নার কথা শুনে শম্পিরও কেমন কান্না পেয়ে গেল। চোখ ছলছল করতে লাগল। ডাকু আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, "এই আরম্ভ হল তোর ছিঁচকাঁদুনেগিরি। চল, চাঁদ উঠেছে। এই বেলা যাই।"

কোপেনহেগনের রাস্তা দিয়ে শম্পির চেয়ার-গাড়ি যেন হঠাৎ ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। কোথা থেকে একটা সাদা ঘোড়া যোগাড় করেছে ডাকুদাদা। পাশেপাশে টগবগিয়ে চলছে। হাওয়ায় শম্পির চুল উড়ছে, কানের পাশ দিয়ে শাঁ-শাঁ করে বাতাস বইছে, শম্পির চেয়ার শূন্যে উঠে পড়ল। ভীষণ হাওয়ার শব্দের মধ্যে দিয়ে ডাকুর গলা ভেসে আসছে। "শম্পি, সামলে—এ-এ। হ্যান্ডেলটা শক্ত করে ধরে থাকিস। দু হাতে-এ-এ-এ।"

আকাশ থেকেই জলপরীটাকে দেখতে পেল শম্পি। কী সুন্দর! কী সুন্দর! কিন্তু, দেখলেই এত বেচারা - বেচারা লাগে, যেন একটা কান্না দিয়ে গড়া পুতুল। নীলচে শরীরটার ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। শম্পি দেখল, পরী-মেয়ের চোখ দিয়ে সত্যি-সত্যিই জল পড়ছে। সেই জল ফোয়ারার মতো শূন্যে উঠে শম্পিকে ভিজিয়ে দিতে লাগল। শম্পির ইচ্ছে হল পরীকে আদর করে, তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। যেমনি সে নামতে গেল, অমনি সমুদ্রের মধ্যে প্রচন্ড হুম হুম শব্দ হল। কেঁপে উঠল চতুর্দিক। শরীরের মধ্যে কিলবিল-কিলবিল করতে-করতে যেন কতকগুলো অদৃশ্য সাপ ঢুকে পড়েছে। হ্যাঁচকা টান মারছে তার পায়ে। ঢেউয়ের মধ্যে থেকে একটা বিকটদর্শন দৈত্য আগুনের চোখ নিয়ে গর্জন করতে-করতে ছুটে আসতে লাগল।

"ডাকুদা, বাঁচা-ও!" চিৎকার করে কেঁদে উঠল শম্পি। তারপর প্রাণপণে শূন্যের মধ্যে দিয়ে দৌড় লাগাল। দৌড়তে-দৌড়তে দেখল তাদের বাগানের মধ্যে শুকনো পাতার ঘূর্ণি উঠেছে, আকাশ ভয়ংকর কালো, ডাকু কোথাও নেই।

স্টীলের হুইল-চেয়ার গাছতলায় উল্টে পড়ে আছে। চড়চড় করে বৃষ্টি পড়ছে। সে একা-একা দৌড়ে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। ট্যাক্সি থেকে সেইমাত্র নেমে দাঁড়িয়েছেন মা-বাবা। দেখলেন শুকনো পাতার ঘূর্ণির মধ্য দিয়ে, বৃষ্টি-ভেজা, ঝড়ে-ওড়া একটা ছোট্ট সাদা পাখির মতো হোঁচট খেতে-খেতে দৌড়ে আসছে চার বছর যে এক পাও হাঁটেনি, সেই তাঁদের নয়নের মণি একমাত্র মেয়ে শম্পি-সোনা।

পরদিন কলকাতার সমস্ত কাগজেই তোমরা খবরটা নিশ্চয় দেখেছিলে। "বজ্রাঘাতে চলচ্ছক্তি লাভ। গড়িয়া নিবাসী অধ্যাপক অর্ধেন্দু ঘোষাল ও তাঁর পত্নী সুনন্দা ঘোষালের একমাত্র কন্যা অষ্টমবর্ষীয়া শম্পা ঘোষাল চার বৎসর বয়স হইতে এনকেফেলাইটিস রোগে চলচ্ছক্তিহীন। গতকাল ঝড়ের সময় বাগানে একটি নিমগাছতলায় তাহার হুইল-চেয়ারে মেয়েটি অঘোরে ঘুমাইয়া পড়ে। কল্যকার প্রচন্ড বজ্রপাতে তাহাদের বাগানের নিমগাছটি পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শম্পা চলচ্ছক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। এ-বৎসর বজ্রশক্তির এই তৃতীয় অলৌকিক কীর্তি। চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী মহল ইহার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম বলিয়া স্বীকারোক্তি দিয়াছেন..."

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

★

লণ্ডন শহরের সেন্ট পল্‌স গির্জার ঘণ্টা এক দিন মধ্যরাত্রে তেরোটা-বাজা শুনিয়েছিল। আরো অদ্ভুত কথা, সেই তেরোটা-বাজা শোনার জন্যে একজনের প্রাণ রক্ষা পায়। রাজা উইলিয়ম এবং রানী মেরি তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে। রাজপ্রাসাদের এক সান্ত্রির প্রাণদণ্ড হল। সে নাকি রাত্তিরে পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিচারের সময় সে বারে-বারে বলেছিল, "আমি ঘুমোইনি। তার প্রমাণ আমি সেন্ট পল্‌সের ঘণ্টায় তেরোটা বাজা শুনেছি।" কেউ সে-বেচারির কথা বিশ্বাস করল না, বলল, সেন্ট পল্‌স থেকে রাজপ্রাসাদ অনেক দূরে, ঘণ্টা সে শুনতেই পারে না। প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়ে গেল। তারপরে কিন্তু দেখা গেল সে ঠিকই বলেছিল, তেরোটা-বাজা অনেকেই শুনেছে। অগত্যা তাঁর ফাঁসির হুকুম মকুব করতে হল।

আগের কথা : শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি হাজারিবাগের পিসিমার কাছে পাওয়া এই পুরনো আঙটি ? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, তার খোঁজ মিলেছে। পিসিমার অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে হাজারিবাগে এসে শিশির শোনে, টেলিগ্রাম ভুয়ো। তারপর···

॥ ১১ ॥

শোনার ভুল কিংবা মনের ভুল ভেবে শিশির আবার পা বাড়াতেই শব্দ শুনল হাসির। এবার বংশীকে দেখতে পেল।

জল-ট্যাঁকির দিক থেকে বংশী এগিয়ে আসছে। আসলে চোখের সামনে বালিয়াড়ির মতন উঁচু একটানা ঢিবি থাকলে আড়ালের মানুষকে কেমন করে আর দেখা যায়!

বংশী এখানকার লোক। বাজারে তার একটা ছোটখাটো স্টেশনারি দোকান রয়েছে। শিশিরেরই সমবয়সী। তাস খেলার নেশা খুব। আবার আজগুবি গল্প বলায় ওস্তাদ। শিশিরের সঙ্গে ভাব আছে বংশীর।

কাছে এসে বংশী এক চোট হেসে নিল। তারপর বলল, "হঠাৎ?"

শিশির বলল, "চলে এলাম।" বলে হাসল। "তুমি ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?"

বংশী গিয়েছিল তার বাড়িতে। একটা কাজ ছিল। শেষ করে লাইন টপকে শর্টকাট করে ফিরছে। দোকানে যাবে।

শিশিরকে হাত ধরে টানল বংশী। "চলো, দোকানে গিয়ে বসবে।"

আপত্তি করল না শিশির।

দুজনে বাজারের দিকে হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে বংশী বলল, "কলকাতা থেকে ঝপ করে চলে এলে যে? এত তাড়াতাড়ি তো তুমি আসো না!"

শিশির জবাব দিল না। বংশীর কেন, যে-কোনো লোকেরই এটা চোখে পড়ার কথা। শিশির বছরে বার দুইয়ের বেশি এখানে আসে না। সে জায়গায় মাত্র সেদিন ঘুরে গিয়ে আবার এসেছে এতে তো বংশী অবাক হবেই।

সামান্য চুপচাপ থেকে শিশির শেষে বলল, "একটা কাজ ছিল।"

"ও!" বংশী আর আগ্রহ দেখাল না।

শিশির অন্য কথা ভাবছিল। ভাবতে-ভাবতে সাধারণভাবে বলল, "এখানে বৃষ্টি কেমন হচ্ছে?"

"মোটামুটি। বর্ষা এবার যাই-যাই করছে।"

"কলকাতাতেও," শিশির বলল। "আর কী খবর বলো? তোমার তাস-পার্টি কেমন চলছে?"

হাসল বংশী। মাথা নেড়ে বলল, "মাঝে-মাঝে বসে। রোজ হয় না। আমার বাড়িতে অসুখ-বিসুখ চলছে। মায়ের শরীর খারাপ।"

"কী হয়েছে?"

"পেটে আলসার বোধহয়। এখন একটু ভাল।"

কথা বলতে-বলতে বাজারে পৌঁছে গেল দু'জনে। এখন সব ফাঁকা। মানে লোকজন নেই প্রায়। একটা বাস সবে টাউন থেকে এসে পৌঁছল। দোকানপত্র খোলা আছে। রাস্তার একপাশ জুড়ে গাছের ছায়া। ছায়া দিয়ে হাঁটতে লাগল শিশিররা।

সামান্য এগিয়ে বংশীর দোকান।

"তোমাদের এখানে নাকি জোর ডাকাতি হয়েছে?" শিশির বলল।

"হ্যাঁ, আমিও শুনলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। ভোলাবাবুর বাড়িতে ডাকাতি করা মুশকিল। ওদের লোকলশ্কর আছে। বন্দুক আছে। তবু ডাকাতি হয়ে গেল। এখানে কিছু বদমাশ টাইপের লোক জুটেছে।"

শিশির শুনল। কিছু বলল না।

বংশীর দোকান খোলা। তার একজন বুড়োমতন লোক আছে। দোকানে বসে ছিল।

বংশী দোকানে এসে বলল, "কাল্দা, তুমি একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাবে। বলবে, ওষুধ দুপুর পর্যন্ত চলবে। নতুন ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে যাও। আর শোনো, দোকানে বলে যাও, দুটো চা দিয়ে যাবে।"

কাল্দা চলে গেল।

দোকানের ভেতরে বসল দু'জনে। একটা টেবিল-পাখা চলছে। শিশির আর বংশী গায়ে হাওয়া লাগাতে লাগল।

এ-সময় বংশীর দোকানে বড় একটা খদ্দের আসে না। সকালের দিকে কিছু আসে, আর আসে সন্ধের দিকে। সন্ধের দিকেই বরং বেশি। বেশির ভাগ বাঙালি বংশীর দোকান থেকেই জিনিসপত্র কেনে। না কিনলে হয়তো দোকান তুলে দিতে হত। সিজ্ন টাইমের তিন-চার মাসের ওপর ভরসা করে তো আর বারো মাস দোকান চালানো যায় না।

দু'জনেই একটু গা জুড়িয়ে নিল। চা এল সামান্য পরে।

শেষে শিশির বলল, "তুমি এখানকার লোকজন সবাইকে চেনো বংশী?"

"চিনব না? বাঃ! আমার বাড়ি এখানে।"

শিশির ভাবল। কথাটা বলবে, না বলবে না? বংশী ভাল ছেলে। তাঁকে কিছু বললে ক্ষতি হবে না। বরং উপকার হতে পারে।

শিশির বলল, "তোমাকে ক'টা কথা বলব! কথাগুলো কিন্তু অন্য কাউকে বলতে পারবে না।"

বংশী হেসে ফেলল। নিজের পেটে গুঁতো মারল। বলল, "আমি পেট-পাতলা। তবে তেমন কিছু হলে বলব না।"

"তেমন কিছুই তোমাকে বলব।"

"বলো।"

শিশির আঙটির কথা তুলল না। ওটা এখন থাক। টেলিগ্রামের কথাটাই বলল বংশীকে।

বংশী অবাক। বিশ্বাস করতে পারছিল না। "তুমি ঠিক বলছ?"

"বাঃ! নয়তো আমি আসব কেন হঠাৎ?"

বংশী মাথা চুলকে বলল, "এইটুকু জায়গা। সবাই প্রায় সবাইকে চেনে। তোমার পিসেমশাইকেও। কে এমন বদমাইশি করবে? কেনই বা করবে?"

কেন করবে শিশির তা ভাঙল না। বলল,

"তামাশা করার জন্যে করেছে?"

"ধ্যাত্। তামাশা এ-সব নিয়ে কেউ করে?"

"জব্দ করার জন্যে?"

"তোমার পিসেমশাই মাটির মানুষ! তাঁকে কেন জব্দ করতে চাইবে?"

"তবে?"

বংশী ভাবছিল। কোনো সদুত্তর পাচ্ছিল না।

শিশির এবার কথা ঘোরাল। "আচ্ছা, আমি দুজন লোকের কথা বলছি। একজনের নাম জানি না, অন্যজনের জানি। প্রথম জনের কথা তোমায় বলছি। ভেবে দেখো তো এ-রকম কাউকে এখানে দেখেছ কি না?"

বংশী তাকিয়ে থাকল।

শিশির কলকাতায় গড়ের মাঠে দেখা লোকটার বর্ণনা দিল। প্রায় নিখুঁতভাবে।

বংশী ভাবতে লাগল। মাঝে-মাঝে এটা ওটা জিজ্ঞেস করছিল। কান ঘাড় চুলকেও যেন মানুষটাকে মনে আনতে পারছিল না।

"না, এ-রকম কাউকে আমি দেখিনি।" বলে বংশী নস্যির কৌটো বার করল।

"কিছুদিন আগেও নয়? ধরো, আমি যখন এসেছিলাম?"

মাথা নাড়তে নাড়তে বংশী নস্যির বড়সড়

টিপ নাকে গ্রঁজল। তারপর আচমকা বলল, 'তুমি সিংহীবাবুর কথা বলছ না তো?"

"সিংহীবাবু! কে সিংহীবাবু?"

"কে সিংহীবাবু তা জানি না। রেল-ফটকের কাছে একটা বাড়িতে থাকতেন। পাগলা ধরনের। রোগা দেখতে। তবে তাঁর বয়েস হয়েছে। ছেলে ছোকরা নয়।"

"কী করতেন সিংহবাবু?" শিশির উত্তেজিত হয়ে উঠল।

"বলা মুশকিল। আমি জানি না। শুনেছি, সিংহীবাবু বাইরে থেকে এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিলেন। ওঁর নাকি পাওয়ার ছিল।"

"কিসের পাওয়ার?"

"ওই—ওই নানা রকম অদ্ভুত কান্ড দেখাতে পারতেন।"

"এখন উনি নেই?"

"দেখিনি অনেকদিন।"

"বাড়িতে গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে না?"

"বাড়িতে বোধহয় একলাই থাকতেন। ওঁর কেউ আছে বলে শুনিনি। দেখিওনি কাউকে।"

শিশির মনে-মনে ঠিক করল, আজই বাড়ি ফেরার সময় একবার দেখে যাবে সিংহীবাবুর বাড়ি। "ফটক পেরিয়ে ডান দিকে?"

"হ্যাঁ, পুকুরের কাছে, প্রথম বাড়ি।"

"ও বুঝেছি। সেই ভাঙা-ভাঙা বাড়িটা।" শিশির বাড়িটা মনে করতে পারল।

"আর-একজন কে?" বংশী জিজ্ঞেস করল।

শিশির একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, "অন্য লোকটার নাম প্রয়াগ। ষন্ডামার্কা দেখতে। কুচকুচে কালো। পরেশনাথের বাড়ি। বেটাকে একেবারে ক্রিমিন্যালের মতন দেখায়।"

বংশী সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "প্রয়াগ নয়, আমি ওই টাইপের একজনকে জানি, তার নাম সুখিয়া। বেটা খুনে। ডাকাত। পুলিসের ভয়ে পালিয়েছে এখান থেকে। ও তো বগোদর থেকে এসেছিল। এক নম্বরের শয়তান।"

শিশির কেমন দ্বিধায় পড়ল। প্রয়াগ আর সুখিয়া কি একই লোক? (ক্রমশ)

ছবি সুনীল শীল

তোমাদের কাছে কেন আবেদন জানাই?

তোমরা ছোটরাই কলকাতার ভবিষ্যৎ। কারণ আমরা বড়রা তো কলকাতার নোংরা, ঘিঞ্জি, আবর্জনা, ভিড় আর নৈরাশ্য নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে ফেলেছি। আমাদের ছোটবেলার কলকাতা শুধুই অবহেলিত। পঞ্চাশ বছর ধরে এক চরম উদাসীনতা, দারিদ্র্য, উদ্বাস্তু সমস্যায় শহরটা আগাছা পরগাছার মত যেদিকে সেদিকে বেড়ে উঠলো। আজ যখন আমরা ক্লান্ত তখন অনেক আশার কথা, কাজ, উদ্যম চোখে পড়ছে।

কিন্তু তোমরা ছোটরা? তোমাদের অনেকেরই জন্ম কলকাতার ভাঙচুর আর নতুন নতুন প্রকল্পের কালে। তোমাদের চোখে অনেক আশা কলকাতাকে নিয়ে। আমরা দেখেছি শুধু অবক্ষয়। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সমাধানের ইঙ্গিত ও কর্মচাঞ্চল্য। আজকের কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে তোমরা ভাবতে পার একদিন মেট্রোরেল চলবে। একদিন কলকাতার 'আবর্জনা-নগরী' এই অপবাদ ঘুচবে। মানুষ পাবে যথেষ্ট জলের যোগান, উপযুক্ত রাস্তাঘাটে বাস ট্রামের অভাব হয়তো থাকবে না বস্তীবাসীদেরও সুরাহা হবে।

এ সমস্তর একটাই কারণ। তোমরা জন্মে থেকে কলকাতা উন্নয়নের কাজকর্ম চলতে দেখছো। তোমরা কি ভাবছো এ বিষয়ে চিঠি লিখে জানিও।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ. ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

'স্বরসঙ্গম'-এর ছাত্রছাত্রীদের এক মনোজ্ঞ চিত্রকলা প্রদর্শনী হল বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার গ্যালারিতে। অনেক ছবি ছিল। নামজাদা ও অভিজ্ঞ অধ্যক্ষের কাছে শিখে এ-প্রতিষ্ঠানে ছোট বড় শিল্পীরা খুব চমৎকার-চমৎকার ছবি দেখিয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন বিকলাঙ্গ। কিন্তু তাতে কী, তারাও যা ছবি এঁকেছে, শাবাশ না দিয়ে কেউ পারবেন না। বিশেষ করে সংঘমিত্রা মৈত্রের রচনা দেখলে কে বলবে সে বিকলাঙ্গ? যেমন রঙের বাহার, তেমনি রচনার বাহাদুরি।

নীলাক্ষী মিত্রের স্টিল লাইফ, যে ছবিটি এখানে ছাপা হল, কত নিখুঁত কাজ। ছবিটি প্যাস্টেলে আঁকা। প্যাস্টেলে আঁকা হলেও পুরোপুরি পেইন্টিং-এর মেজাজ আছে ছবিটিতে।

একটা কথা বলতে হয়, স্বরসঙ্গমের ছাত্রছাত্রীদের কাজ শুধুই 'ছোটদের খেয়াল খুশি নয়, রীতিমত ব্যাকরণ মেনে চিত্ররচনা। বহু রচনা আছে যা দেখে বোঝা যায় ক্রিয়াকৌশলে শিল্পীরা দারুণ ওস্তাদ। রোহিত ওরহির স্কেচ, শ্যামলী সাহার মা ও শিশু, অনন্যা পান্ডার রিকশা স্ট্যান্ড, শিবানী দাশগুপ্তের বাজারের দৃশ্য, বাসব সান্যালের স্কেচ, দিলীপ গোস্বামীর চিতোর গড়, সুরেশ আগরওয়ালের প্রতিকৃতি, সুমিতা রেড্ডির কলকাতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

–অহিভূষণ মালিক

বন্দরের এই ছবির মধ্যে তিনটি সাধারণ মাছ, একটি তারা-মাছ ও একটি সামুদ্রিক চিল লুকিয়ে আছে। খুঁজে বার করো।

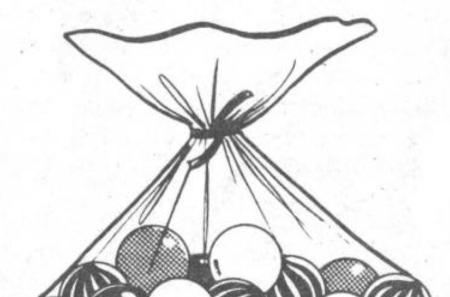

প্লাস্টিকের এই থলের মধ্যে কোন্ রকমের গুলি ক'টা আছে, গুনে বলো।

শিশিরকুমার বসু

॥ ২৪ ॥

ষাটের দশকের শেষের দিকে একদিন ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরছি, প্রবীণ শিখ ড্রাইভার নানারকম গল্প করতে-করতে বাড়িতে পৌঁছে দিল। গাড়িবারান্দায় থেমেই বলে উঠল, "তুমি শরৎবাবুর বাড়িতে আসবে আগে বলোনি কেন, এ-জায়গাটা আমার খুব চেনা। কতবার কত লোককে এখানে পৌঁছে দিয়েছি।" বিশেষ করে তিরিশ বছর আগেকার একটা ঘটনা তার মনে পড়ে গেল। বলল, "তখন গান্ধীজি এখানে রয়েছেন. আমরা দল বেঁধে এসেছি সন্ধ্যায় তাঁর প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে। ছাদ ভরে গিয়েছে, সেজন্য আমরা ঐ দরজাটার সামনে ধস্তাধস্তি করছি। শেষ পর্যন্ত দরজার বড় কাঁচটা আমাদের চাপে ভেঙে গেল!

কথাটা শুনে আমারও সেই সময়কার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভার সময় ভিড় সামলাতে আমাদের হিমসিম খেতে হত। মনে আছে আমি একদিন লোহার কোলাপসিবল গেট ধরে সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। ছাদে আর জায়গা নেই। গাড়িবারান্দায় যাঁরা আছেন তাঁদের অনেক বোঝাবার চেষ্টা করছি, বলছি, বুঝতেই তো পারছেন এটা পাব্লিক প্লেস নয়, বসতবাড়ি, জায়গা কম; আপনারা আর একদিন আসুন। এক ভদ্রলোক আমাকে শাসিয়ে বললেন, "দ্যাখো তোমার যুক্তি আমি মানতে রাজি নই, মহাত্মা গান্ধী ইজ এ পাবলিক ম্যান, হোয়্যারএভার হি স্টেজ বিকামস এ পাবলিক প্লেস। তাঁর প্রার্থনাসভায় যোগ দেবার অধিকার থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করতে পারো না।"

সন্ধ্যায় উডবার্ন পার্কের বাড়ির ছাদটা প্রার্থনাসভার সময় ভরে তো যেতই, কত লোক যে আশেপাশে বারান্দায় বা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকত তার হিসেব নেই। তাছাড়া বাড়ির সামনের রাস্তায় বিকেল থেকেই ভিড় জমে থাকত। তারা মাঝে-মাঝে 'গান্ধী মহারাজ—কি জয়' ধ্বনি দিত। প্রার্থনাসভা আরম্ভ হবার আগে গান্ধীজি মাঝে-মাঝে ছাদের ধারে এসে তাদের দর্শন দিতেন। তাঁকে দেখা গেলে আরও ঘন-ঘন ও সজোরে ধ্বনি উঠত।

আমাদের বাড়িতে প্রার্থনাসভায় কেবল যে রামধুন হত তা-ই নয়, অন্য ধরনের অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হত। সবচেয়ে জমত যখন দিলীপকুমার রায় গান গাইতেন। ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক গান তো গাইতেনই। মাঝে-মাঝে ইংরেজিতেও প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতেন। এক সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে তিনি 'অ্যাবাইড উইথ মি' গেয়েছিলেন। কী পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। উমা বসুকে তিনিই সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন, যাঁর গান শুনে গান্ধীজি তাঁকে "নাইটিঙ্গেল অব ইন্ডিয়া" নাম দিয়েছিলেন।

এই সূত্রে দিলীপবাবুর কথা একটু বলে নিই। গান্ধীজি আমাদের বাড়িতে আসবার কিছু আগে দিলীপকুমার আমাদের সঙ্গে বেশ দিনকতক ছিলেন। গানের আসর ছাড়াও তাঁর প্রাণোচ্ছল কথাবার্তায় সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখতেন। ছোটদের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলতে পারতেন। দুপুরে তিনি যখন খেতে বসতেন মা তো থাকতেনই, আমরাও আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতাম তাঁর রসিক মনের আস্বাদ পাবার আশায়। একদিন বললেন, তোমাদের একটা পরীক্ষা নেব, শব্দ ঠিকমতো উচ্চারণ করার পরীক্ষা। দু লাইনের একটা ছড়া ঠিকমতো যে যত তাড়াতাড়ি বলতে পারবে, তার ততই কৃতিত্ব। তিনিও আমাদের সঙ্গে পাল্লা দেবেন। ছড়াটি হল ঃ

তেলে চুল তাজা
জলে চুন তাজা

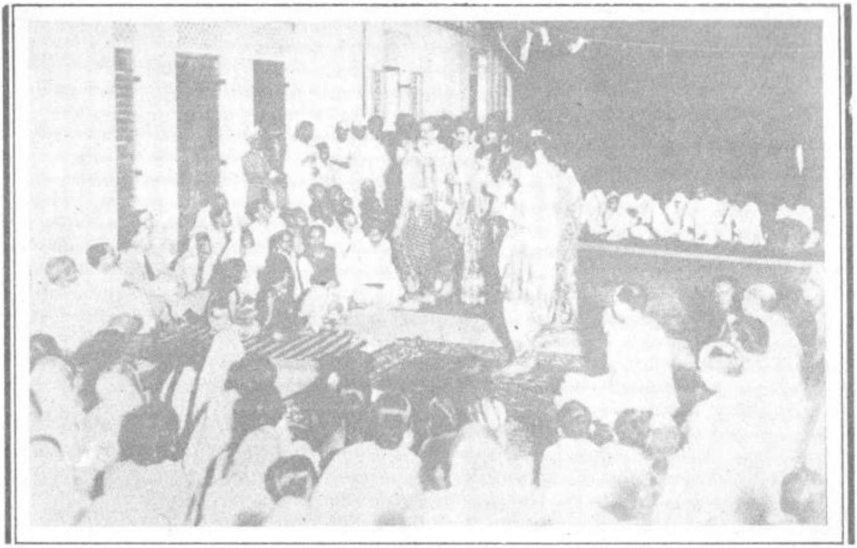

উডবার্ন পার্কের বাড়ির ছাতে গান্ধীজির জন্য আয়োজিত ছৌ-নৃত্য। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন গান্ধীজি। সামনে সুভাষচন্দ্র। তাঁর পিছনে শরৎচন্দ্র

তাড়াতাড়ি করে বলতে গিয়ে আমাদের তো কথা উল্টোপাল্টা হয়ে যায় কিংবা উচ্চারণে আটকে যায়। দিলিপবাবুই শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন।

তিনি তো গেরুয়া পরতেন। আমি ভাবতাম গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী এত হাসি-খুশি হন কী করে। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ও সখ্য কারুরই চোখ এড়াত না। যুদ্ধের পর দিলীপবাবুর সঙ্গে বেশ কিছুকাল দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর কাজ খানিকটা এগোবার পর আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি, পুনাতে তাঁর আশ্রমে গিয়ে দেখা করি। তাঁর কাছে রাঙাকাকাবাবুর যা চিঠিপত্র ছিল, সেগুলো তো অসঙ্কোচে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেনই, শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত তিনি রিসার্চ ব্যুরোর কাজে ক্রমাগত আমাদের উৎসাহ ও আশীর্বাদ দিয়ে গেছেন। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর দুটি খুব বড় অনুষ্ঠানে তিনিই প্রধান ছিলেন। বারেবারেই আমাকে বলেছেন, "এটা খুব বড় কাজ, চালিয়ে যেও। দেশ যদি সুভাষকে ভুলে যায় তাহলে দুঃখের আর সীমা থাকবে না।"

একদিন তো গান্ধীজির জন্য আমাদের ছাদে ওড়িশার ছৌ-নৃত্যের আয়োজন করা হয়েছিল। আর একদিন হল ব্রতচারী নাচ, গুরুসদয় দত্ত নিজে নাচ পরিচালনা করলেন এবং নাচে অংশগ্রহণও করলেন। ঐ দুদিন আমাদের মনে হয়েছিল বুঝিবা আমাদের ছাদ ভেঙে পড়বে। অতগুলো মানুষের দাপাদাপি এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে গান ও ঢাক-ঢোলের কান-ফাটানো আওয়াজ!

সকাল-সন্ধ্যায় লাঠি হাতে কারুর কাঁধে ভর দিয়ে এই ছাদেই গান্ধীজি পায়চারি করতেন। গরমের দিনে অতি সাধারণ একটি খাটে শুয়ে ছাদে রাতও কাটিয়েছেন। উঠতেন ভোর চারটেতে। সেজন্য ভোরের প্রার্থনাসভা ও বেড়ানোর খবর আমি জানি না। রাত আটটা নাগাদ শুয়ে পড়তেন। আমি এখনও ভেবে অবাক হই, রাত না জেগে গান্ধীজি এত কাজ কী করে করতেন। তাঁর সারাদিনের প্রোগ্রাম ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলত, কোনও কারণেই তার হেরফের হত না। সন্ধ্যায় তাঁর খাবার সময় ছটা, এক মিনিট আগেও হবে না, এক মিনিট পরেও হলে চলবে না। যদি কোনও বিশেষ অতিথি সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি এসে কথা বলতে পারেন, গান্ধীজি কিন্তু খেতে-খেতেই তাঁর কথা শুনবেন।

গান্ধীজি তাঁর পাশে বেশ কয়েকটি

MEET THE BEST !
AUDION
MINI GENERATOR
An ideal Home and Office Generator for all purposes.
Keeps Fans, Refrigerators, Lights, almost any Electrical Gadgets including your TV running.
audion
STATIC GENERATOR
A purchase—your office and home desparately deserves.
Available at :
SUKANTA
OPP. NEHRU CHILDREN'S MUSEUM NEAR CIRCULAR ROAD CROSSING
Publicity Media

অনুগত শিষ্য-শিষ্যা পেয়েছিলেন। আর পেয়েছিলেন সত্যিই একজন দক্ষ সেক্রেটারি —মহাদেব দেশাই। মহাদেব দেশাই এত কাজের মধ্যেও অভাবনীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। তাঁকে অবশ্য খাটতে হত খুব কিন্তু মুখে সব সময়েই হাসি লেগে থাকত। মহাদেব দেশাই বেশ ভালই বাংলা জানতেন এবং দু-চার ছত্র বাংলা লিখে মাঝে-মাঝে আমাদের দেখাতেন। গান্ধীজিও নাকি সেই সময় বাংলা শিখছিলেন। মহাদেব দেশাইকে সাহায্য করতেন পিয়ারেলাল। গান্ধীজির দলে অন্যদের মধ্যে ছিলেন সুশীলা নায়ার, কানু গান্ধী ও আভা গান্ধী। একবার কস্তুরবাও এসেছিলেন কয়েকদিনের জন্য। তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা ও ব্যবহারে আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

গান্ধীজি যখন আমাদের মধ্যে থাকতেন, সাত-সকালে ঘণ্টা বাজিয়ে হাজির হত একটা ছাগল, সঙ্গে আসত দুটি ছাগ-শিশু। গান্ধীজি যে ছাগলের দুধ খেতেন, সেটা তো সকলেই জানেন। তবে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ধরনটা আমাদের একটু অদ্ভুত ঠেকত। শাক-সব্জি সিদ্ধ, দই ও রসুনবাটা ইত্যাদি একটা কাঠের পাত্রে নিজের হাতে মিশিয়ে তিনি একটা জগাখিচুড়ি তৈরি করতেন—খেতে কেমন হত কে জানে! সঙ্গে কিছু ফলমূল থাকত। তিনি কিন্তু বেশ তৃপ্তি করে খেতেন। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সম্বন্ধে তাঁর একান্ত নিজস্ব কিছু মতামত ছিল—পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এসব বের করেছিলেন বলে তিনি দাবি করতেন। ডাক্তার-দের মতামতের তিনি বড় একটা ধার ধারতেন না, তা সেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বা যে-কেউ হোন না কেন। আমাদের রান্নাবাড়িতে পিয়ারেলাল এক বিশেষ দেশী যন্ত্রের সাহায্যে গান্ধীজির জন্য পাঁউরুটি তৈরি করতেন। কিন্তু গান্ধী-মার্কা পাঁউরুটি খেতে খুব ভাল হত বলে আমাদের মনে হত না। সেই সময় কলকাতার বিশেষ কোনও হোটেলের পাঁউরুটির বেশ নামডাক ছিল। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গান্ধীজিকে সেই পাঁউরুটি চেখে দেখতে রাজি করানো গেল। খেয়ে তিনি কিন্তু স্বীকার করলেন যে, আমাদের পাঁউরুটিই ভাল।

(ক্রমশ)

বাঘা মামা

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

চিড়িয়াখানার বাঘা মামা
গায়ে তোমার খাসা জামা।
ডোরাকাটা হলদে-কালো
ছিটটা মামা সত্যি ভাল!

ছিটের অমন কোটটা গায়ে
জুতো কেন নেইকো পায়ে?
দেয়নি কিনে তোমার বাবা?
পরলে জুতো ঢাকত থাবা।

ফেলতে যদি ল্যাজটা কেটে,
পারতে পেণ্টু পরতে এঁটে।
গোঁফ-দাড়ি-চুল দিব্যি ছেঁটে,
বিলেত যেতে পারতে হেঁটে।

বিলেত থেকে ফিরতে ঘরে
মেম-মামিকে সঙ্গে করে।
তোমার মাসি আমার পুষি
বউটি দেখে হত খুশি।

নাড়ছ মাথা তুলছ হাই,
সাহেব হওয়ার ইচ্ছে নাই?
বেশ তাহলে খাঁচায় থাকো,
হালুম হুলুম শুধুই ডাকো।

ছবি দেবাশিস দেব

উইং থেকে গোল

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
(পি. কে.)

॥ ১৮ ॥

উনিশশো ছাপ্পান্নর ফুটবল মরসুমে আমাদের রেল-টীম মুশকিলে পড়ল। মেওয়ালাল এরিয়ান ক্লাবে চলে গেলেন। আগের বছর তিনজন তরুণ ফুটবলার আমাদের কোচ বাঘা সোমকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। আমি থেকে গেলেও ভব রায় আর তরু গাঙ্গুলি রেল টীম ছেড়ে গেলেন। বাঘাদা সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন মেওয়ালালের জন্য। মেওয়াদাকে তিনি অসম্ভব ভালবাসতেন। অবশ্য, দুঃখ পেলেও ভেঙে পড়ার লোক বাঘা সোম ছিলেন না। কিছু নতুন খেলোয়াড় টীমে নিলেন। গোলে মানব মল্লিক আর এস বসাক এলেন। ফরোয়ার্ড হিসাবে দিপু দাসকে আনা হল।

ঠিক এই অবস্থায় বাঘাদার ট্রেনিং ছেড়ে কিছুদিনের জন্য আমাকে ভারতের বাইরে যেতে হল। সেবার মোহনবাগানের দূরপ্রাচ্য সফরে যাওয়ার কথা। বেঙ্কটেশ আহত থাকায় মোহনবাগানের অধিনায়ক শৈলেন মান্না আমাকে টীমের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন। রেল থেকে ছুটি না পেলেও যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেলাম। ম্যানেজার আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে টীমের সঙ্গে গেলেন যথাক্রমে শৈলেন দে এবং করুণা ভট্টাচার্য।

যাওয়ার আগে আমাদের গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তোলা হল। জামশেদপুর থেকে বাবা এসে আশীর্বাদ করে গেলেন। আমার মাত্র দুই সেট জামাপ্যান্ট। সফরের জন্য একটা গলাবন্ধ সবুজ কোট পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও আমার কোনো ব্লেজার নেই। উনিশশো সাতচল্লিশের ভারতীয় দলের একটা ব্লেজার অবশ্য আমার গায়ে চড়ল। কে দিলেন? কে আবার, শৈলেন মান্না।

সিঙ্গাপুরের ফাইভ স্টার হোটেল দেখে চোখ ছানাবড়া। ঢাকার শাহবাগ হোটেল তো এর কাছে শিশু! বয়সের দিক দিয়ে নয় কিন্তু! বিরাট ঘর। সিল্কের স্লিপিং স্যুট। নিজের ঘরের বাথরুম থেকে চুনী গোস্বামীর ফোন এল : "তোর ঘরটাও এই রকম? বাথরুমে ফোন আছে?" গলাবন্ধ সবুজ কোট পরে সকলে ডাইনিং রুমে গেলাম। কিন্তু সব কিছুতেই শুয়োর বা গোরুর মাংস থাকায় টোস্ট ছাড়া আর কিছুই খেতে পারলাম না। আগে কখনো ঐসব খাইনি তো! এমন আরামের হোটেল, কিন্তু না খেলে কি ভাল লাগে? পরদিন সকালে মান্নাদা আমার ঘরে এসে বললেন, "এই নে, তোর জন্য চারটে মাটন চপ যোগাড় করে এনেছি।!" চপ খেয়ে পেট কিছুটা শান্ত হল। রাত্রে মান্নাদা হাসতে-হাসতে বললেন, "প্রদীপ, ওটা মাটন নয়, শুয়োরের মাংসেরই চপ ছিল। বেশ তো খেয়ে নিলি। এখন দেখবি সব-কিছু খেতে পারবি।"

ইন্দোনেশিয়ায় মেডান একাদশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান ১—০ গোলে জিতল। দ্বিতীয় ম্যাচে ডাচ-ইন্দোনেশিয়ান কম্বাইন্ড টীমের বিরুদ্ধে ফ্লাইং হেডে গোল করলাম। সেই গোলেই মোহনবাগান জিতল। ফরোয়ার্ড লাইনে আর ছিলেন সমর (বদ্রু) ব্যানার্জি, কেষ্ট পাল, চুনী গোস্বামী এবং রামন। সাত্তারদাও এই সফরে মাঝে-মাঝে খেলেছেন।

পাডাংয়ে বেড়াতে গেলাম। সমুদ্র থেকে তৈরি হওয়া প্রায় একশো বর্গমাইল জুড়ে বিখ্যাত পারাপত লেক আমাদের মুগ্ধ করল। চমৎকার কটেজ, তবে রাত্রে বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল।

পরের ম্যাচে ডাচ-ইন্দোনেশিয়ান সম্মিলিত দলের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ২—১ গোলে হেরে গেলাম। পারাপত হ্রদে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছিলাম। পরদিন তার ফল পেতে হল। তখন আমরা জানতাম না যে, খেলার দিন বা আগের দিন ঐভাবে স্নান করলে শরীর খেলার উপযুক্ত থাকে না।

ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয়দের আমরা হারিয়েছিলাম পাঁচ গোলে। দুটি গোল আমি করেছিলাম। টীমের সকলেই সেদিন ভাল খেললেন।

সিঙ্গাপুরে জিতলেও হংকংয়ে আমাদের প্র্যাকটিস দেখে স্থানীয় ফুটবল-রসিকেরা হতাশ হলেন। কিন্তু সেখানে প্রথম ম্যাচে আমরা ৫—১ গোলে জিতে গেলাম। আমি এই ম্যাচে পেলাম তিন গোল। রামন আর চুনীর খেলাকে স্থানীয় সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়ান রোপট্রিকে'র সঙ্গে তুলনা করল। পরের ম্যাচে হংকং সম্মিলিত একাদশ হারল আধ ডজন গোলে। কিন্তু অঘটন ঘটল পরের ম্যাচে। মোটামুটি ভাল খেলেও আমরা এক গোলে হেরে গেলাম। অফসাইডের অজুহাতে আমাদের তিন-তিনটি গোল নাকচ করলেন এক ব্রিটিশ রেফারী।

এই সফরে সবচেয়ে বেশি গোল করলেন সেন্টার ফরোয়ার্ড কেষ্ট পাল। তাঁর ষোল গোলের পরেই ছিল আমার স্থান—তেরো গোল। অসাধারণ হেডওয়ার্ক এবং দু'পায়ে দুর্দান্ত শট ছিল কেষ্ট পালের প্রধান অস্ত্র। তবে এই সফরে আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করলেন রামন। উনিশশো বাহান্নর হেলসিঙ্কি অলিম্পিক খেলে ফেরার পথে ভারতীয় দলের হয়ে এই অঞ্চলে কিছু ম্যাচ খেলে গিয়েছিলেন রামন। শুনেছি, তাঁর অনবদ্য ড্রিবল তখনও মাঠে-মাঠে যেন অজস্র

শৈলেন মান্না

ফুল ফুটিয়ে দিয়েছে। এই সফরের সময় রামন নিশ্চয় আগের গতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু যা দেখলাম, শেখার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। বলের ওপর এমন নিরঙ্কুশ দখল আর কারো মধ্যে দেখিনি। রামনই আমার দেখা সেরা ভারতীয় ফরোয়ার্ড। ভাবতে পারো, এই বহুমুখী প্রতিভাবান ফুটবলার মেওয়ালালকে বসিয়ে সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলেছেন, আমেদ খানকে বসিয়ে লেফট ইনসাইডে খেলেছেন, সালেকে বসিয়ে লেফট আউট হিসেবে খেলেছেন। এলেবেলে ম্যাচে নয়, এসব কান্ড তিনি ঘটিয়েছেন ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে! বল আর বিপক্ষ ডিফেন্ডারের মাঝখানে নিজেকে রাখার কৌশলকেই আধুনিক ফুটবলে স্ক্রিনিং বলা হয়। এই স্ক্রিনিং প্রথম দেখেছিলাম রামনের মধ্যে।

সিঙ্গাপুরে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে এই চুক্তিতে মোহনবাগান খেলছিল যে, যত টিকিট বিক্রি হবে, সেই অনুপাতে টাকা ক্লাব পাবে। হাতখরচ হিসেবে আমাদের কয়েক ডলার দেওয়া হত। কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড় কিছুটা হালকা মেজাজেই দাবি তুললেন, মাঠে যখন এত ভিড়, হাতখরচ আরও বেশি দিতে হবে। মাঠে ঢুকেই তাঁরা সকৌতুকে বলতেন, "গুনে ফ্যালো ভাইসব, কত লোক আছে!" একদিন সকালে সুশীল গুহর নেতৃত্বে আমরা প্রায় সবাই ম্যানেজার শৈলেন দেকে

চুনী গোস্বামী

ঘেরাও করলাম। প্রায় শব্দটা ব্যবহার করতে হচ্ছে, কারণ মান্নাদা আর এস দত্ত এই অর্থ-নৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন না। শৈলেন দে খুব শক্ত ধাতের মানুষ, সব সময় চেষ্টা করতেন কীভাবে মোহনবাগান ক্লাবের তহবিল বাড়ানো যায়। কিন্তু আমাদের ওই দাবি তিনি হাসিমুখেই মেনে নিলেন। সিঙ্গাপুরে ছিলাম তিনদিন। সেই তিনদিনের জন্য আমরা হাতখরচ পেলাম মোট দেড়শো ডলার। একটুও দেরি না করে, একশো ছাপ্পান্ন ডলার দিয়ে একটা দারুণ 'রোলেক্স' ঘড়ি কিনে ফেললাম। ঘড়িটা এখনও আছে।

কলকাতায় ফিরতে না ফিরতেই লীগ শুরু হয়ে গেল। প্রথম ম্যাচেই পুলিসের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলাম। পুলিস টীমের গোলে ছিলেন তখনকার বিখ্যাত গোল-কীপার মণীশ সরকার। ভ. মন্দ মিলিয়ে মরসুম এগোল। নিখিল নন্দীর দেওয়া গোলে আমরা মোহনবাগানকে হারালাম।

এই বছরেই বুখারেস্টে যুব উৎসব ফুটবলের ফাইনালে রাশিয়ার কাছে হেরে গিয়েছিল শক্তিশালী চীনা দল। সেই টীম কলকাতায় তিনটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে এল। প্রথম দিন মোহনবাগান কচুকাটা হল ৮—১ গোলে। দূরপ্রাচ্য সফরে এত ভাল খেলে আসার পর মোহনবাগানের এই শোচনীয় পরাজয় সমর্থকদের হতাশ করল। দ্বিতীয় ম্যাচে চীনা দল মহামেডানস্পোর্টিংকেও অনেক গোলের ব্যবধানে হারাল। শেষ খেলা আই এফ এ একাদশের সঙ্গে। যতদূর মনে পড়ছে, আমাদের ফরোয়ার্ড লাইন ছিল এইরকম : পি কে ব্যানার্জি, আমেদ খান (সাত্তার), ওমর, কিট্টু এবং মুসা। অভাবনীয় ফুটবল খেলে আমরা ৩—০ গোলে জিতলাম। প্রথমে মুসা, তারপর কিট্টু গোল করলেন। ডানদিক দিয়ে ঢুকে বাঁ-পায়ের শটে তৃতীয় গোলটি আমি পেলাম।

লীগ শেষ হয়ে এল। দুই রেলের 'গোলাপের যুদ্ধে' বি এন আর টীমকে আমরা হারিয়ে দিলাম। শীল্ডে কোয়ার্টার ফাইনালেই আমাদের হার মানতে হল।

সামনেই মেলবোর্ন অলিম্পিক। তাই ঠিক হয়েছিল, তার আগে অক্টোবর মাসেই ত্রিবান্দ্রমে জাতীয় ফুটবলের আসর বসবে। বাংলার টীম দারুণ—মেওয়ালাল, সাত্তার, কিট্টু, কানাইয়ান—সকলেই আছেন।

মাদ্রাজ মেলে উঠেই কয়েকজন সিনিয়র ফুটবলারের তাস খেলা শুরু হল। খড়গপুরে ডিনার এল, তাঁরা খাওয়ার সময় পেলেন না। রাত বাড়ল, কিন্তু আলো নেভাতে বলার সাহস আমাদের হল না।

প্রথম দুটি ম্যাচে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানকে আমরা হারালাম ৮—০ এবং ১২—০ গোলে। দ্বিতীয় দিনে পাঁচটি গোল আমিই করলাম। হাফব্যাক পদ্ম মিত্র ফ্রী কিক থেকে দুটি গোল করলেন।

এই দুটি ম্যাচে প্রতিপক্ষ বড্ড বেশি দুর্বল হওয়ায় আমাদের বিন্দুমাত্র লড়তে হয়নি। সেমিফাইনালে মাঝারি শক্তির দল বোম্বাইয়ের কাছে আমরা এক গোলে হেরে গেলাম। সেই যে হাওড়া স্টেশন থেকে তাস খেলা শুরু হয়েছিল, ত্রিবান্দ্রমে এসেও তাতে একটুও ছেদ পড়েনি। দিনের পর দিন ট্রেনে বা বাইরে থাকার একঘেয়েমি কাটানোর জন্য কোনো-কোনো ফুটবলার তাস খেলেন। তাতে অন্যায় নেই। কিন্তু বাড়াবাড়ি করলেই মুশকিল। খেলার আগের দিনও যদি রাত জেগে তাস খেলা হয়, তার ফল খারাপ হতে বাধ্য। কথায় বলে 'তাসে নাশ'। বাড়াবাড়ি হলে শুধু নাশ নয়—সর্বনাশ!

ফাইনালে উঠল বোম্বাই আর হায়দরাবাদ। মেলবোর্ন অলিম্পিকের ট্রায়ালে বত্রিশজন ফুটবলারকে ডাকা হল। সেমিফাইনালে হেরে গেলেও বাংলার ষোলজনের নাম থাকল।

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলের ভারতীয় অধিনায়ক আজিজ একদিন হায়দরাবাদ শিবিরে নিয়ে গেলেন। স্বনামধন্য কোচ রহিম সাহেবের কাছে গিয়ে বললন, "এই হল আমার পি কে!" রহিম সাহেব বললেন, "তুমি তো খুব ভাল ড্রিবল করো। কিন্তু এত ভাল ভাল নয়। মডার্ন ফুটবলের মূল কথা হল 'ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ'। গোলের দিকে যাবার 'শর্টেস্ট রুট' খুঁজে নিতে হবে। টীম গেম খেলতে হবে।"

হায়দরাবাদ শিবির থেকে বেরিয়ে আসার মুখে দেখি একটি ছেলে কম্বলের নীচ থেকে একটা চোখ বার করে জুলজুল করে আমাকে দেখছে। আজিজ বললেন, "ছেলেটা দারুণ খেলছে। নাম জানো আশা করি—বলরাম!"

(ক্রমশ)

হবি

মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

বাবার হবি দাবা খেলা
কাকার হবি আঁকা।
মামার হবি গামার মতো
কুস্তি নিয়ে থাকা।
পিসির হবি শিশি-বোতল
জমিয়ে রাখা ঘরে।
কাসুন্দি তেল ঘি আর মধু
সাজিয়ে থরে-থরে।
দাদার হবি গাদাখানেক
বন্ধু নিয়ে সাথে
সাতসকালে ক্রিকেট খেলা
কোঠাবাড়ির ছাতে।
দাদুর হবি আদুরে তাঁর
নাতির সাথে ঘোরা।
দিদার হবি খিদা পেলে
মুখেতে পান পোরা।
মায়ের হবি ভায়ের গায়ের
জন্যে বোনা উল।
আমার হবি সবার হবি-র
খোঁজ রাখা নির্ভুল।

তেরো-স্পর্শ

সুজিত সরকার

যদি পাই লটারিতে টাকা
ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকা–
দিন-রাত এ-কথা ভাবেন
আমাদের নরহরি-কাকা।
আশা নিয়ে একদিন ভোরে
বাজারে যাবার নাম ক'রে
কিনলেন একটা টিকিট
যদি লাগে কপালের জোরে।
দিন যায়, কী জানি কী হবে,
ফলাফল বেরোবে যে কবে,
রাতারাতি বড়লোক-হওয়া
সফল হবে কি বাস্তবে!
এল সেই দিন অবশেষে—
নরহরি খুললেন হেসে
খবরের কাগজের পাতা
চায়ের দোকানে ভোরে এসে।
"হায়, হায়," উঠলেন ব'লে,
টাক-মাথা আফসোসে দোলে
"লাখপতি হতে পারা যেত
তেরো নম্বর বেশি হলে!"

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

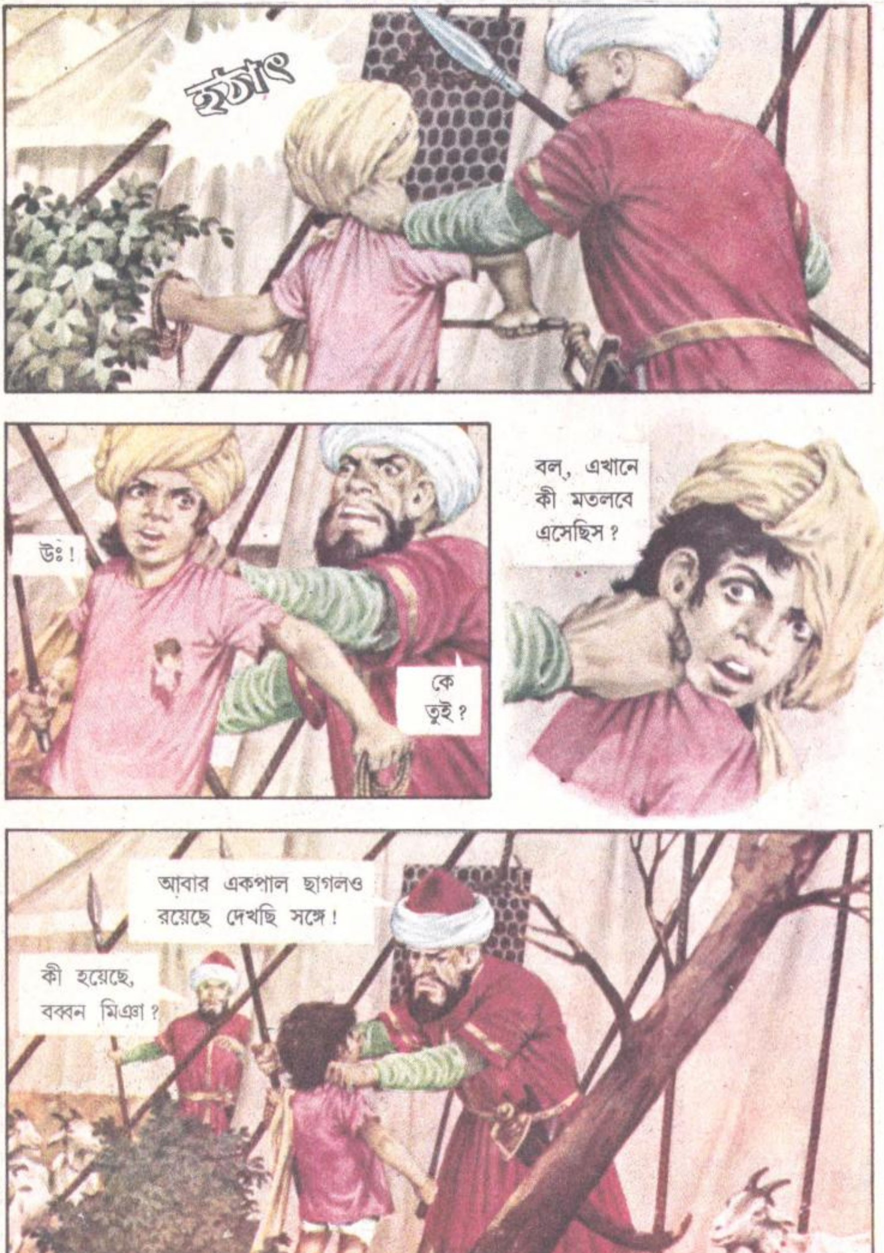
হঠাৎ
উঃ!
কে তুই?
বল্, এখানে কী মতলবে এসেছিস?
আবার একপাল ছাগলও রয়েছে দেখছি সঙ্গে!
কী হয়েছে, বব্বন মিঞা?

হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে সদাশিব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
অসট্রেলিয়ায় পৌঁছেছে রোভার্স দল।
ওই হল সিডনি বন্দরের ব্রিজ।
দেখতে তো মন্দ নয়!
AUSAIR
বাড়ির জন্য মন কেমন করছে অনেকেরই!
কবে যে আবার সমর্থকদের জয়ধ্বনি শুনব!
যা বলেছ!
এখানে সে-ধ্বনি শোনা যাবে না।
কিন্তু হঠাৎ
সিডনি ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট
মেলচেস্টার!
রোভার্স!
আরে!
রোভার্স! রোভার্স!
ভক্তেরা কি টিকিট কেটে এখানেও এল নাকি?
না না, এরা স্থানীয় ভক্ত!
ROVER
সিডনিতেও রোভার্সের ফ্যান ক্লাব রয়েছে
বাব্বা, এখানেও এত ভক্ত!
ইংল্যাণ্ডে থাকতে আমরা রোভার্সেরই ভক্ত ছিলুম!
ইউরোপিয়ান কাপে রোভার্স হারায় আমরা মর্মাহত!
এখানে জিতবার চেষ্টা করব!
জেতা চাই!
হোটেলে ঢুকে সবাই খুশি।
সামনেই সমুদ্র!
কিন্তু সমুদ্রস্নানের আগে মাঠে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে!
রয়, তুমি জ্বালালে!

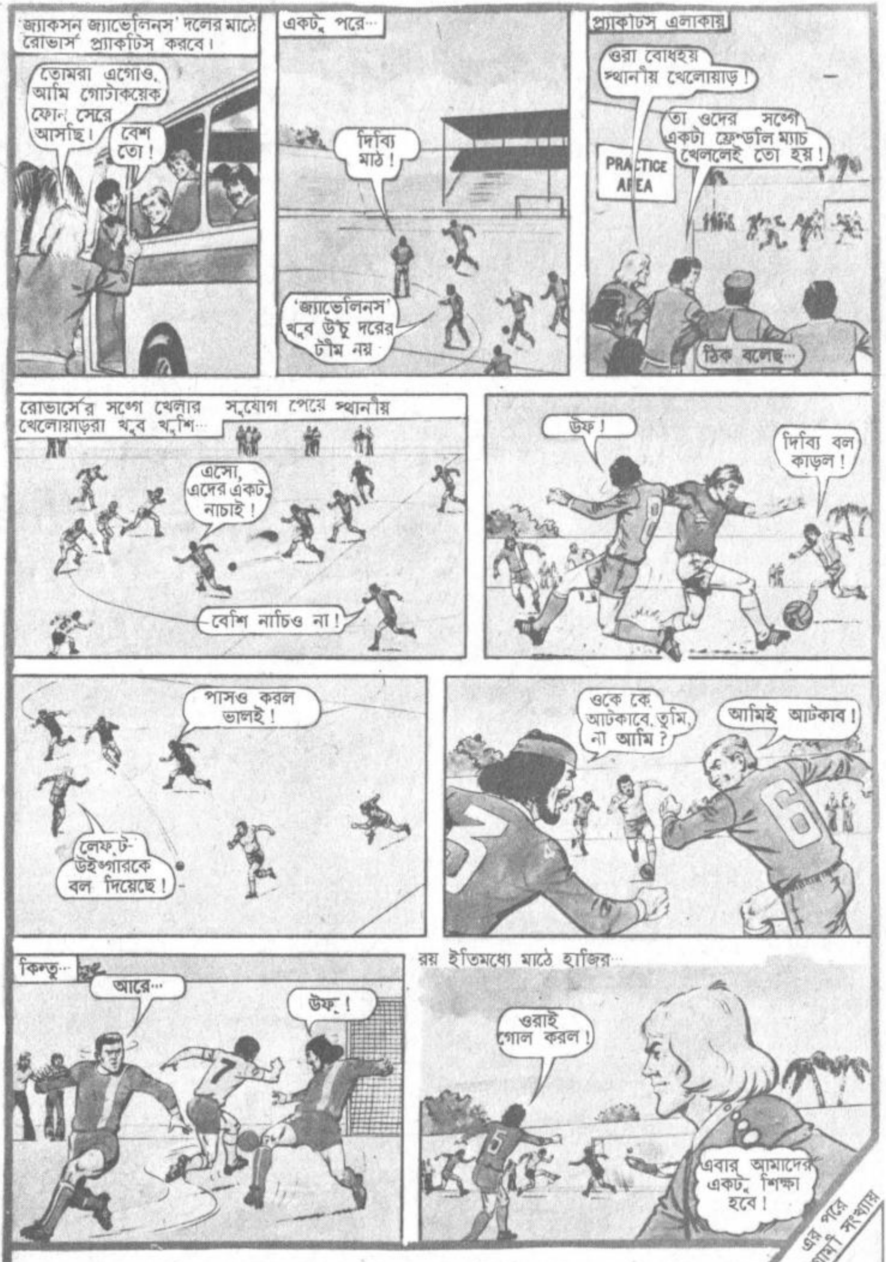

'জ্যাকসন জ্যাভেলিনস' দলের মাঠে রোভার্স প্র্যাকটিস করবে।
তোমরা এগোও, আমি গোটাকয়েক ফোন সেরে আসছি।
বেশ তো!
একটু পরে…
দিব্যি মাঠ!
'জ্যাভেলিনস' খুব উঁচু দরের টীম নয়
প্র্যাকটিস এলাকায়
ওরা বোধহয় স্থানীয় খেলোয়াড়!
তা ওদের সঙ্গে একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেললেই তো হয়!
PRACTICE AREA
ঠিক বলেছ…
রোভার্সের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়ে স্থানীয় খেলোয়াড়রা খুব খুশি…
এসো, এদের একটু নাচাই!
বেশি নাচিও না!
উফ!
দিব্যি বল কাড়ল!
পাসও করল ভালই!
লেফট-উইঙ্গারকে বল দিয়েছে!
ওকে কে আটকাবে, তুমি, না আমি?
আমিই আটকাব!
কিন্তু…
আরে…
উফ!
রয় ইতিমধ্যে মাঠে হাজির…
ওরাই গোল করল!
এবার আমাদের একটু শিক্ষা হবে!
এর পরে আগামী সংখ্যায়

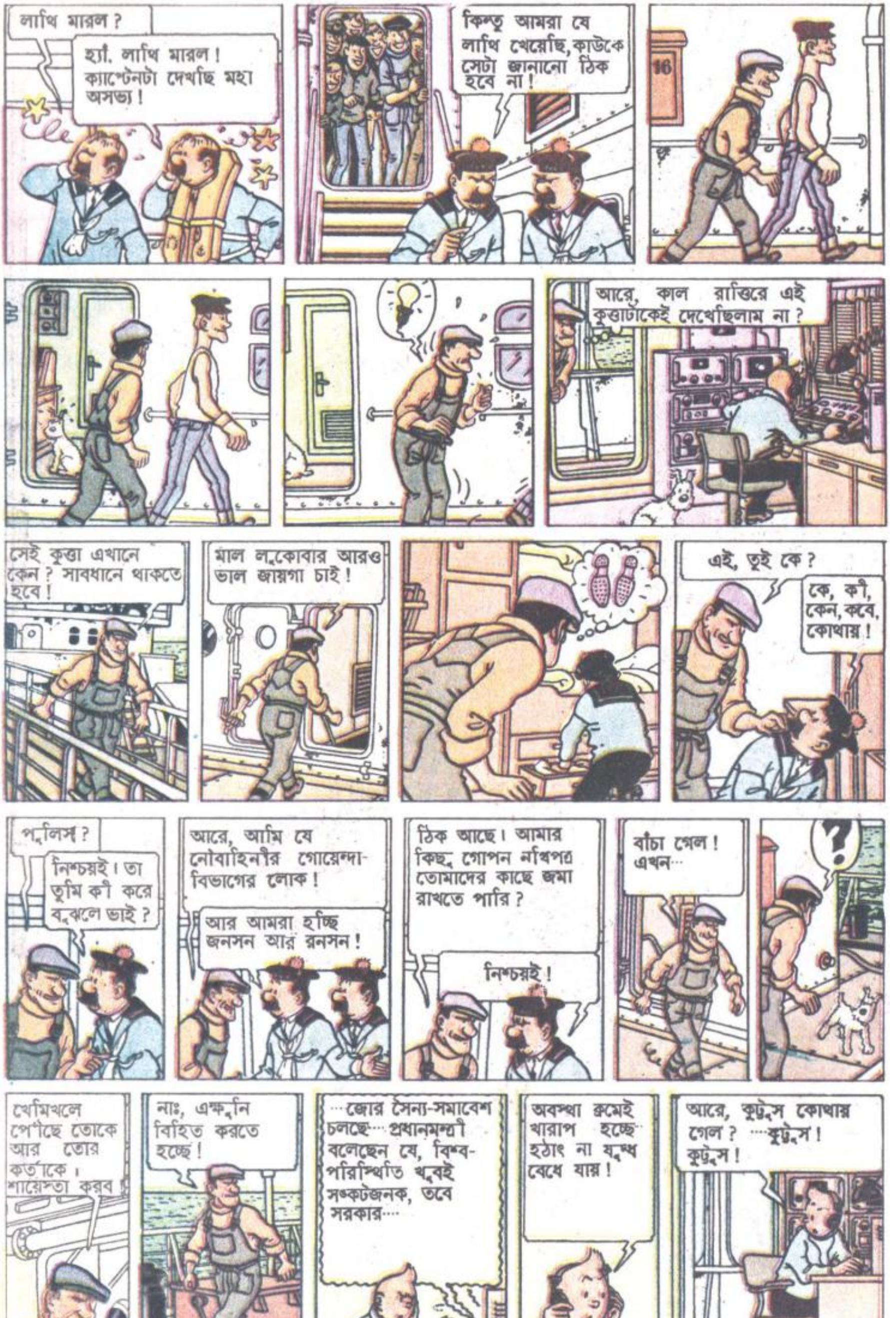
লাথি মারল ?
হ্যাঁ. লাথি মারল ! ক্যাপ্টেনটা দেখছি মহা অসভ্য !
কিন্তু আমরা যে লাথি খেয়েছি, কাউকে সেটা জানানো ঠিক হবে না !
16
আরে, কাল রাত্তিরে এই কুত্তাটাকেই দেখেছিলাম না ?
সেই কুত্তা এখানে কেন ? সাবধানে থাকতে হবে !
মাল লুকোবার আরও ভাল জায়গা চাই !
এই, তুই কে ?
কে, কী, কেন, কবে, কোথায় !
পুলিস ?
নিশ্চয়ই। তা তুমি কী করে বুঝলে ভাই ?
আরে, আমি যে নৌবাহিনীর গোয়েন্দা-বিভাগের লোক !
আর আমরা হচ্ছি জনসন আর রনসন !
ঠিক আছে। আমার কিছু গোপন নথিপত্র তোমাদের কাছে জমা রাখতে পারি ?
নিশ্চয়ই !
বাঁচা গেল ! এখন…
?
থেমিখলে পৌঁছে তোকে আর তোর কর্তাকে। শায়েস্তা করব !
নাঃ, এক্ষুনি বিহিত করতে হচ্ছে !
…জোর সৈন্য-সমাবেশ চলছে… প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বিশ্ব-পরিস্থিতি খুবই সংকটজনক, তবে সরকার…
অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে হঠাৎ না যুদ্ধ বেধে যায় !
আরে, কুট্টুস কোথায় গেল ? …কুট্টুস ! কুট্টুস !

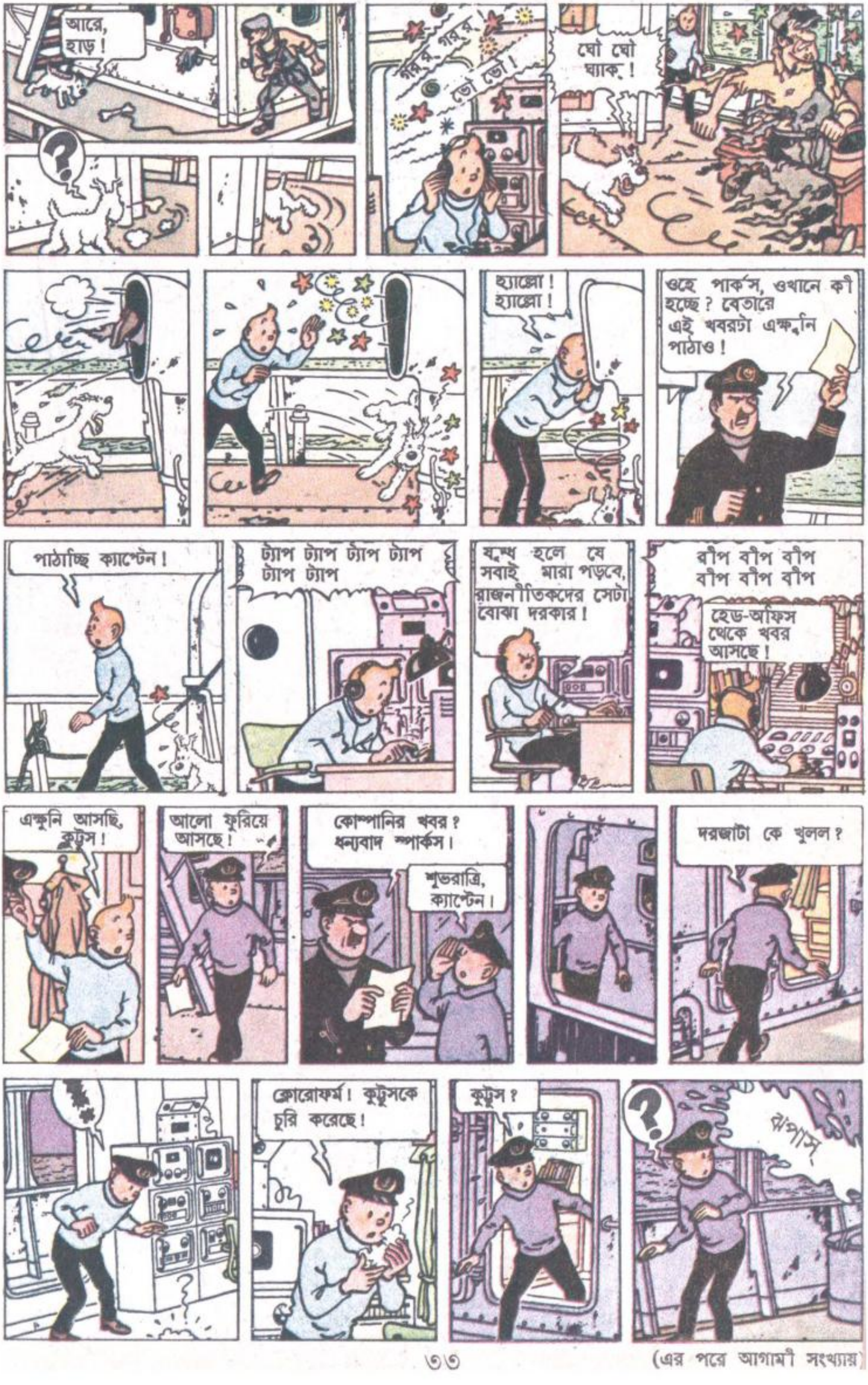

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫	৬		■	
	■	■		■	■	
■	৭				৮	■
৯		■		■	১০	
■		■		■		■
১১			■	১২		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) মাছি। (৩) সিংহের আছে, ফুলেরও আছে। (৫) যে ছেদ করে। (৭) কর্তা যা করেন। (৯) শরীরের কোথাও অস্বাভাবিক ফুলে গেলে কোন্ বাজনা হয়? (১০) চাঁদ। (১১) প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক। (১২) স্বনামধন্য ফকির।

উপর-নীচ : (১) নূপুর। (২) দূরে নয়। (৩) বড়দিন আর জন্মদিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। (৪) ছারপোকা। (৬) প্রাচীন অরণ্যপ্রদেশ এখন মানুষে মানুষে ছয়লাপ। (৭) কোলাহল। (৮) জার্মানি যা ছিলেন।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

■	ভেঁ	পু	■	বা	তা	বি
হি	■	মা	কা	লু	■	শ
র	ঙ্কু	■	ঠ	■	মা	ল্য
ণ্য	■	ক	ঠো	র	■	ক
ক	ঞ্চি	■	ক	■	মু	র
শি	■	ধ	রা	হ	■	ণী
পু	ল	ক	■	নু	ড়ি	■

ধাঁধা

ছোড়দি এসেছিল সুনীপের চিঠি নিয়ে। ছোট্কাকে পড়িয়ে মানেটা বুঝে নেবে।

ছোট্কা ছোড়দির হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ল। একবার নয়, দুবার। তারপর বলল, "এ প্রবলেমটা এখুনি সল্‌ভ করে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে তোকে একটা উত্তর দিতে হবে।"

ছোড়দি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ধাঁধা? তা আমাকে আবার জড়াচ্ছ কেন মিছিমিছি। তুমি বরং ওকে প্রশ্ন করো, ও-ই তো হাঁ করে

বসে আছে ধাঁধার জন্য।" আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছোড়দি খাটের কোণে গিয়ে বসে পড়ল।

ছোট্কা বলল, "বেশ, তাহলে দুজনেই চেষ্টা করো। যে পারে। আর সুনীপের চিঠিটা হোক দু-নম্বর ধাঁধা। ওর উত্তরটা আমি বরং তোর কানে-কানে বলে দেব।"

ছোড়দি বলল, "তাই হোক।"

ছোট্কার বলা ধাঁধা তোমরাও চেষ্টা করো।

প্রথম ধাঁধা ॥ সারা বাড়ি অন্ধকার। তুমি ঘরে ঢুকলে। ঘরে রয়েছে একটা মোমবাতি, একটা হ্যারিকেন, আর একটা গ্যাসের উনুন।

তোমার হাতে রয়েছে একটা দেশলাই বাক্স। সেই বাক্সে রয়েছে একটিই মাত্র কাঠি।

ঘরে ঢুকে তুমি প্রথমে কোন্‌টা জ্বালবে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ সেজদাদুর ছেলে সুনীপ জাহাজে চাকরি পেয়ে লিখেছে—

"আমরা ২ জানুয়ারি ১৯৮৯-তে কলকাতা বন্দর ছেড়েছি। চারটে জাহাজ ওই দিনে একসঙ্গে ছেড়েছে।

একটা জাহাজ প্রতি চার সপ্তাহ বাদে বন্দরে ফেরে, একটা ফেরে প্রতি আট সপ্তাহ বাদে, তৃতীয় জাহাজ ফেরে প্রতি ১২ সপ্তাহ পরে, চতুর্থটি প্রতি ১৬ সপ্তাহের পর।

এই চারটে জাহাজের ফের যেদিন একসঙ্গে দেখা হবে কলকাতা বন্দরে, সেদিন বাড়ি ফিরব আমি।"

সুনীপ কবে বাড়ি ফিরবে? কী বারে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ বছরের কোনো কোনো মাসে তিরিশ দিন, কোনো-কোনো মাসে একত্রিশ দিন। আঠাশ দিন কোন কোন মাসে? খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে হবে।

চতুর্থ ধাঁধা ॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

কমগোধালো

গতবারের উত্তর ॥ (১) বড়র ছিল সাদা ঘোড়া, ছোট ছেলের ছিল বাদামি রঙের ঘোড়া। মন্ত্রী বললেন, ঘোড়া দুটো পালটে নাও দু-জনে, তারপর যে যত জোরে পারো অন্যের ঘোড়া চালাও। তাহলেই নিজের ঘোড়া শেষে আসবে। (২) দুই ভাই নিশ্চিত একসঙ্গে খেলেনি। প্রত্যেকেই অন্য কারও সঙ্গে খেলেছে ক্যারাম। (৩) ঝনৎকার। (৪) INDIVISIBILITY।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

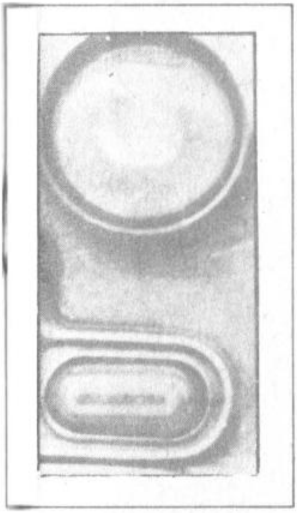

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল কাঁচির আংটার ফোটো।

ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কাদের মুখে খালি 'কা' 'কা' বুলি?

উঃ কাবুলিদের।

প্রঃ আমার গল্পটা তো পড়েছেন, আপনি নিজে হলে কী রকম করে লিখতেন গল্পটা?

উঃ ছদ্মনামে।

প্রঃ গতবছর খরাতে কারা সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল?

উঃ ছাতা ব্যবসায়ীরা।

প্রঃ এখন শোনা যাচ্ছে রাসায়নিক সারের চাইতে পুরনো গোরুর গোবরই ভাল, কথাটা কি সত্যি?

উঃ শুনেছি তো সত্যি, কিন্তু পুরনো গোরু অত কোথায় পাওয়া যাবে।

সুসেন

মজার খেলা

একটা সিকি, একজন বন্ধু, ব্যস, তাহলেই এই মজার খেলাটা খেলা যাবে।

নমস্কারের ভঙ্গিতে বন্ধুর দুটো হাত নীচের ছবির মতো রাখতে বলো।

এবার মধ্যমা আঙুল দুটোকে নামিয়ে দাও। অর্থাৎ তখন নীচের ছবির মতো হবে হাত দুটোর চেহারা। হাতদুটো যেন বেশ জোরে ঠেলে থাকে বন্ধু।

এবার তুমি করবে কী, সিকিটাকে নিয়ে বন্ধুর দুই হাতের অনামিকার মাঝখানে দিয়ে দাও। এবার তাকে বলো, সে যেন সিকিটা ফেলে দেয়। হাত সরানো বা আঙুল মোড়া চলবে না কিন্তু, ওই অবস্থাতেই সিকিটা ফেলতে হবে।

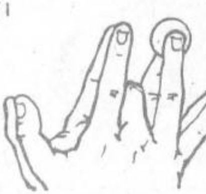

মজার ব্যাপার হল, বন্ধু এই অবস্থায় কিছুতেই ফেলতে পারবে না সিকিটাকে। হ্যাঁ, চেষ্টা করেই দ্যাখো, তারপর দেখবে কী মজা হয়।

মজারু

হাসিখুশি

এক সেলুনে এক ভদ্রলোক চুল কাটাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখলেন একটি কুকুর ঠিক তাঁর চেয়ারের নীচেই বসে খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর চুলকাটা দেখছে। ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে বললেন, "কুকুরটি কী শিক্ষিত!" যিনি চুল কাটছিলেন তিনি কিন্তু প্রতিবাদ করলেন, "না, না, ঠিক তা নয়। আসলে চুল কাটতে গিয়ে অনেক সময় আমি খদ্দেরদের গালের জুলফির বা কানের মাংস কেটে ফেলি ও সেই লোভে বসে আছে।"

এখন আর কলকাতায় সাইকেল-চোর নেই। সবাই যে ধরা পড়েছে তা নয়, সবাই মোটর-গাড়ি চোর হয়েছে।

যখন দুটি কানেই সম্পূর্ণ কালা হয়ে গেলেন, তখন রামবাবু ধরে নিলেন এবার তাঁর চাকরিটি যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তাঁর এখন প্রমোশন হয়েছে, কর্তৃপক্ষ তাঁকে নালিশ ও অভিযোগ দপ্তরের বড়বাবু করে দিয়েছেন। যে যাই বলুক, কিছুই আর এখন কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছবে না।

ছবি অহিভূষণ মালিক

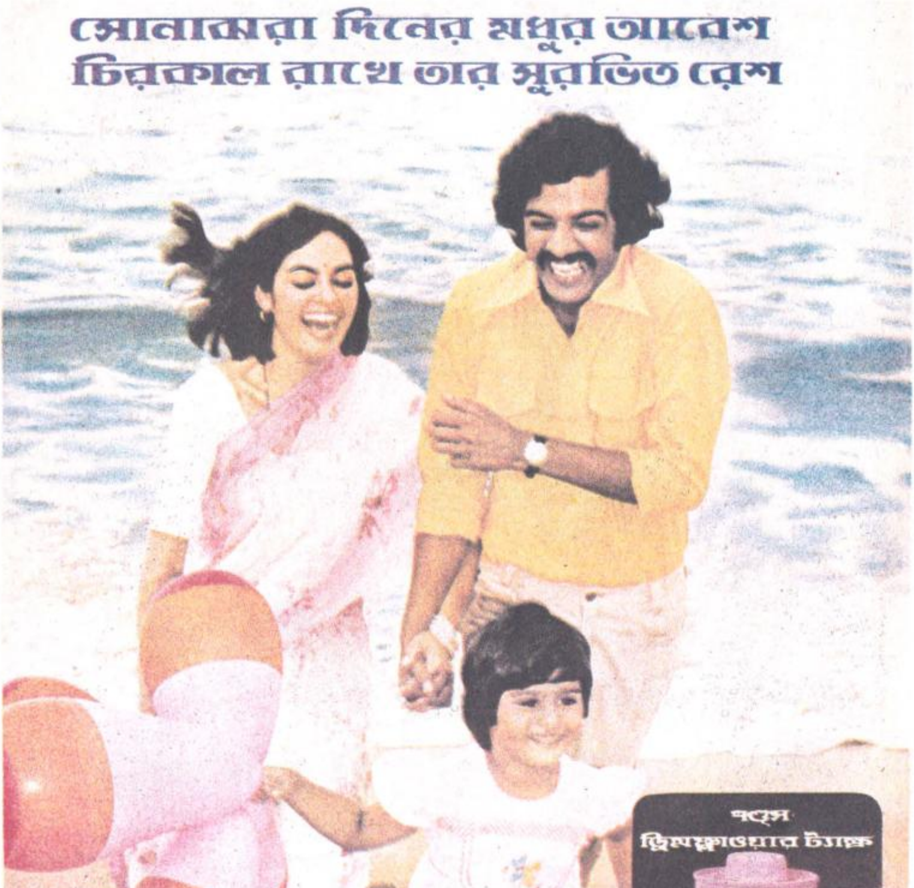

সোনাঝরা দিনের মধুর আবেশ
চিরকাল রাখে তার সুরভিত রেশ
পণ্ডস
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক
Pond's
Dreamflower talc
যে সৌরভ আপনার মন মাতায়

HTM-PIL-2133

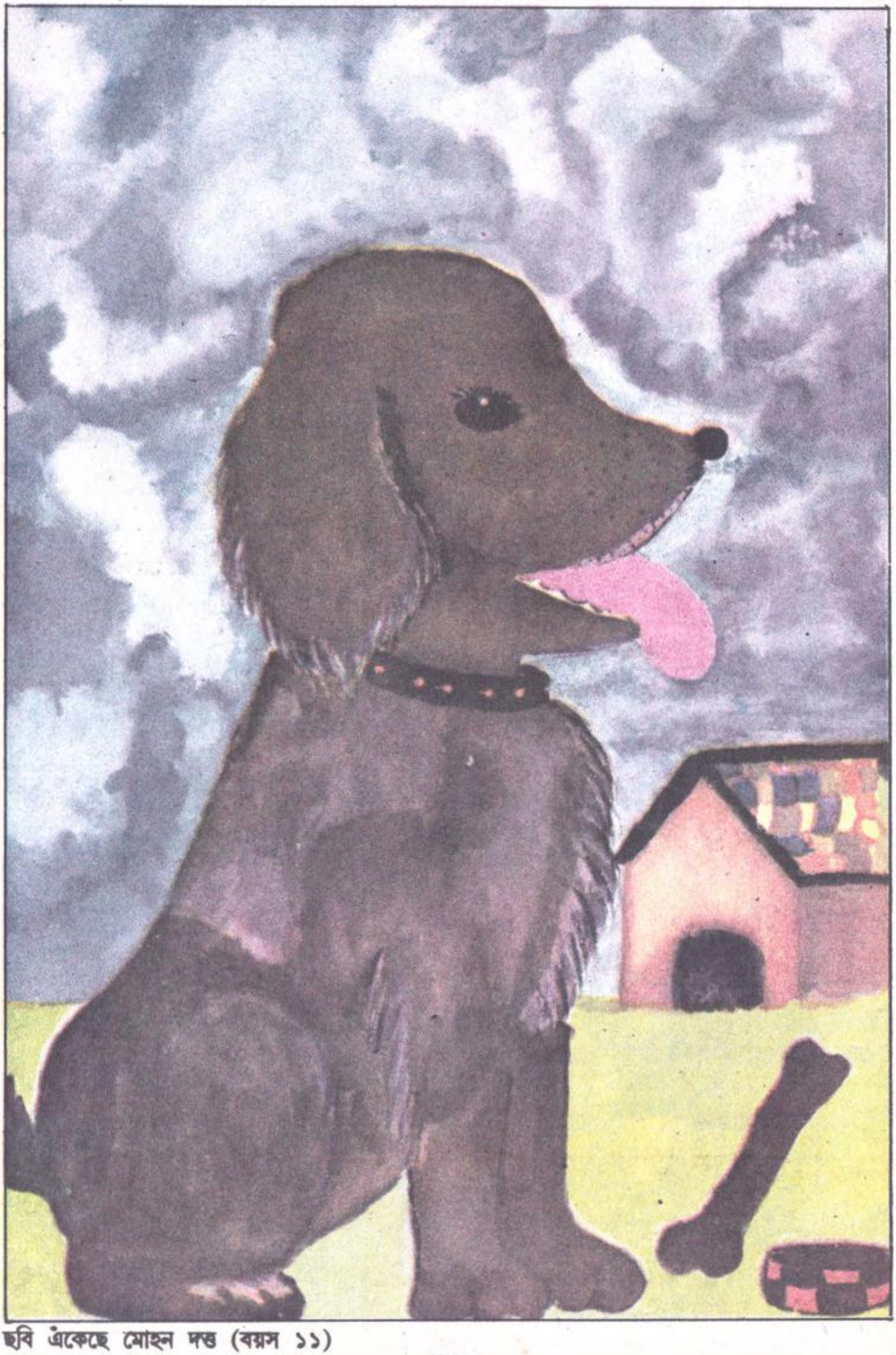

ছবি এঁকেছে মোহন দত্ত (বয়স ১১)

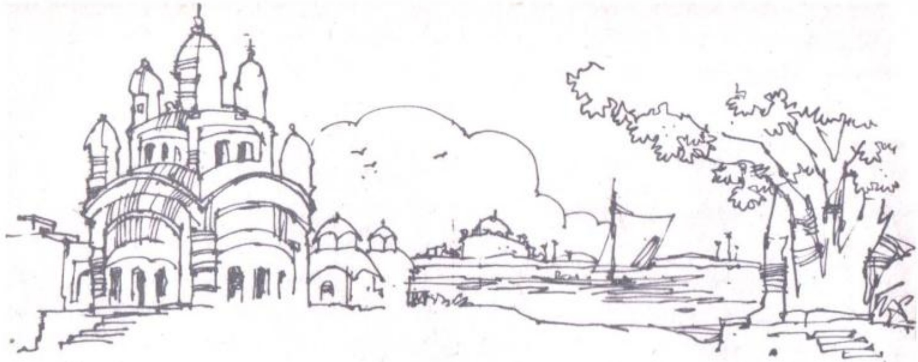

দক্ষিণেশ্বর

আমরা সেদিন দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাস থেকে দক্ষিণেশ্বর-মোড়ে নামলাম। সেখানে লজেন্স খেয়ে প্রথমে একটা গাছে কয়েকটা মুখপোড়া হনুমান দেখলাম। তারা গাছে বসে কলা খাচ্ছিল। সেই গাছের চারদিকে জাল দেওয়া আছে, নীচে লেখা আছে পঞ্চবটী। সেখান থেকে গঙ্গা নদী দেখলাম।

গঙ্গায় অনেকে নৌকো করে বেলুড় যাচ্ছে। গঙ্গায় অনেকে স্নান করছিল। সেখান থেকে বালিব্রিজ দেখলাম। বালিব্রিজ দিয়ে দুটো ট্রেন চলে গেল। তারপর বারোটা শিব মন্দির দেখলাম। শিব ঠাকুরের অনেক নাম—নকুলেশ্বর, জটিলেশ্বর, রত্নেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর ইত্যাদি। তারপর রাধা ও কৃষ্ণের মন্দির দেখলাম। তারপর মা কালীর মন্দির দেখলাম। তারপর আমরা একটা দোকানে উঠে কচুরি আর চমচম খেয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

মেধা জানা (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৯)

বেলুন

গরুর গাড়ি থেকে ঘোড়ার গাড়ি, তারপর রেলগাড়ি, মোটর গাড়িতে চড়েও মানুষের আশা মিটল না। পাখি আকাশে ওড়ে। মানুষেরও বহুকাল থেকে সাধ—পাখির মতো ডানা মেলে আকাশে উড়বে। কিন্তু কেমন করে তা হবে? মানুষের তো পাখির মতো ডানা নেই! তবু প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে চীন এবং গ্রীস দেশের সুসভ্য মানুষ পাখির উড়বার কৌশল নকল করে আকাশে উড়তে চেয়েছিল। অনেকে আবার পাখির মতো দুটো ডানা দেহের দুপাশে বেঁধে উঁচু প্রাসাদ থেকে ঝাঁপ মেরেছে। জন ডামিয়ান নামে স্কটল্যান্ডের একজন চিকিৎসক এই রকম লাফ দিয়েছেন স্টার্লিং দুর্গ থেকে ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে পতন ও হাড়গোড় ভেঙে দুর্ঘটনা ছাড়া কোনও লাভই ভদ্রলোকের হয়নি।

তবু মানুষ থামল না। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে লাগল কী করে আকাশে ওড়া যায়।

গরম ধোঁয়া বাতাসের চেয়ে হালকা। আর গরম বাতাসও ঠান্ডা বাতাসের চেয়ে হালকা। ফরাসি দেশের মন্টগলফিয়ার-ভাইরা একদিন কাগজের বড় থলে তৈরি করে তার ভিতর গরম ধোঁয়া পুরে ছেড়ে দিল। আকাশে উঠল, কিন্তু যেই ধোঁয়াটার গরম কমে গেল, অমনি থলেটা নেমে এল মাটিতে। এরপর ধোঁয়াটা যাতে গরম থাকে, সেজন্য কাগজের ঐ বেলুনটার নীচে আগুন রেখে দেওয়া হল। বেলুন এবার অনেক দূরে পর্যন্ত উড়ে গেল।

আবার বেলুন ওড়ানো হল। ওর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল একটা ঝুড়ি। তার ভেতরে থাকল একটা ভেড়া, একটা মুর্গি আর একটা হাঁস। বেলুনটা আকাশের অনেক ওপরে উঠে ধীরে-ধীরে নেমে এল।

এরপর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের একুশে নভেম্বর রোজিয়ার এবং আরল্যান্ডস নামে দুজন ফরাসি বিজ্ঞানী বেলুন চেপে প্যারিসের আকাশে মনের সুখে পাঁচ মাইল ভ্রমণ করলেন। খুব সম্ভবত এঁরাই শূন্যে বিচরণ

করেছিলেন সর্বপ্রথম। হাইড্রোজেন গ্যাস আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা দেখলেন, বেলুনে গরম ধোঁয়ার চেয়ে এই গ্যাস ব্যবহার করাই সুবিধা।

ফরাসি দেশের একজন অধ্যাপক একবার একটা খুব বড় বেলুন তৈরি করে তাতে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরে আকাশে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আকাশের বহু ওপরে উঠে ওটা কোথায় গেল কেউ তা বুঝতে পারল না।

বেলুনটা কিন্তু পড়েছিল গিয়ে এক মাঠে। গাঁয়ের লোক ওটাকে দেখে ভয়েই জড়সড়!

খবরটা রটে গেল চারিদিকে। কেউ ভাবল ওটা একটা ভয়ানক জানোয়ার। কেউ বলল, আসমান থেকে পড়ে গেছে চাঁদ! সাহসী যারা, তারা দলবল নিয়ে ছুটে এল —হাতে তাদের ল্যাঠি, সড়কি আর বর্শা। জানোয়ারটিকে চার ধার থেকে ঘিরে ফেলে তারা যে যা পেল—ইঁটপাটকেল ছুঁড়ে, লাঠি মেরে, বর্শা বিঁধিয়ে তাকে ঘায়েল করে ফেলল। কাছে গিয়ে পরে তারা দেখতে পেল—ও হরি, আসলে এটা কোন জীবই নয়—একটা কাগজের বড় বেলুন, চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে!

এরপর অবশ্য বেলুন সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে—যুদ্ধের কাজেও একে লাগানো হয়েছে। আজ আমরা বিমানে করে যখন-তখন আকাশে উড়ে যেতে পারি, রকেটে করে চাঁদের দেশেও পোঁছে যাই —কিন্তু আগেকার দিনে এসব কান্ডকারখানা ভাবা যেত না। এর জন্যে মানুষকে মাথা খাটাতে হয়েছে খুব।

– পার্থসারথি চক্রবর্তী

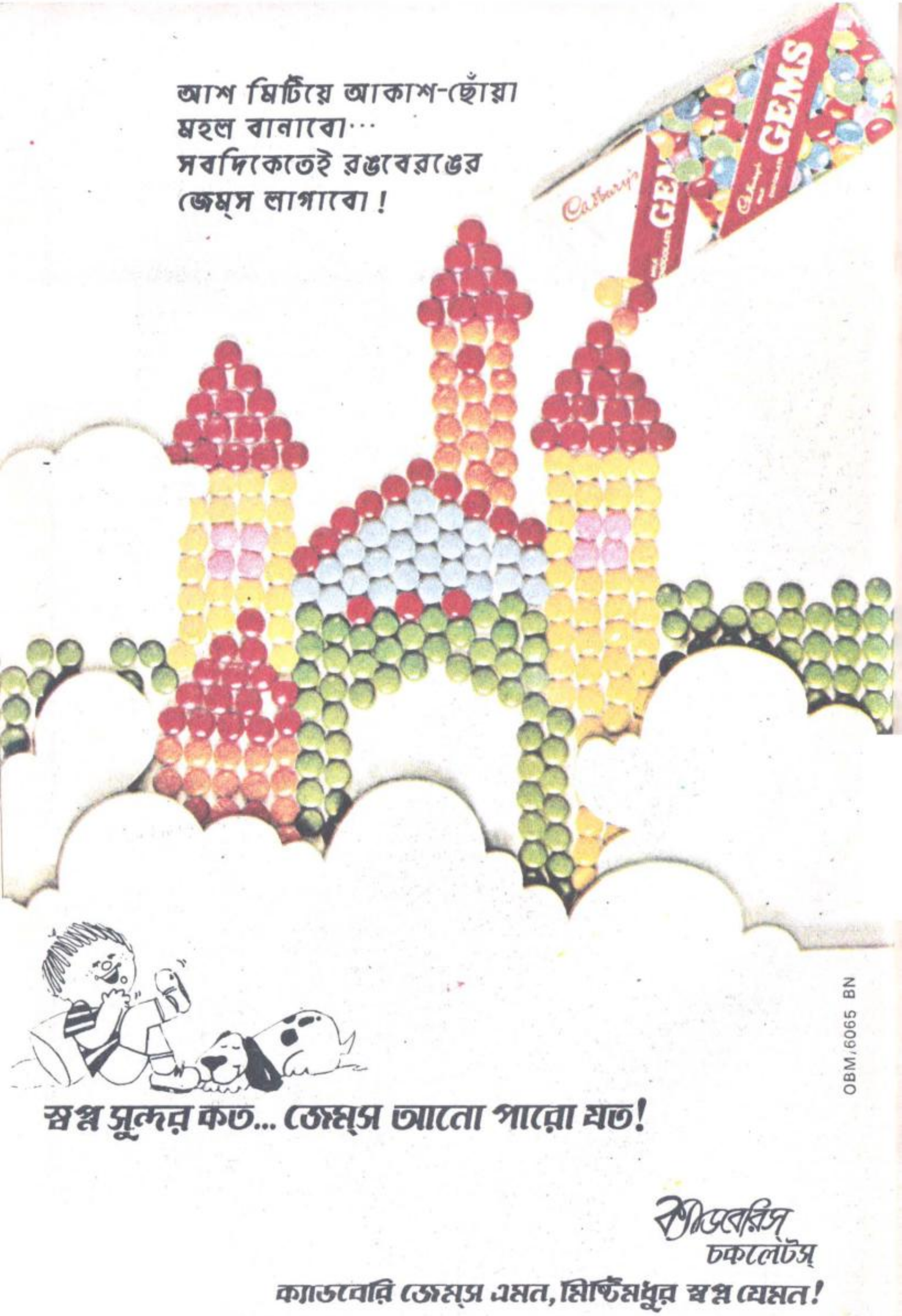
আশ মিটিয়ে আকাশ-ছোঁয়া
মহল বানাবো···
সবদিকেতেই রঙবেরঙের
জেম্‌স লাগাবো !
Cadbury's GEMS
স্বপ্ন সুন্দর কত... জেম্‌স আনো পারো যত!
OBM/6065 BN
ক্যাডবেরিস
চকলেটস্
ক্যাডবেরি জেম্‌স এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেমন!

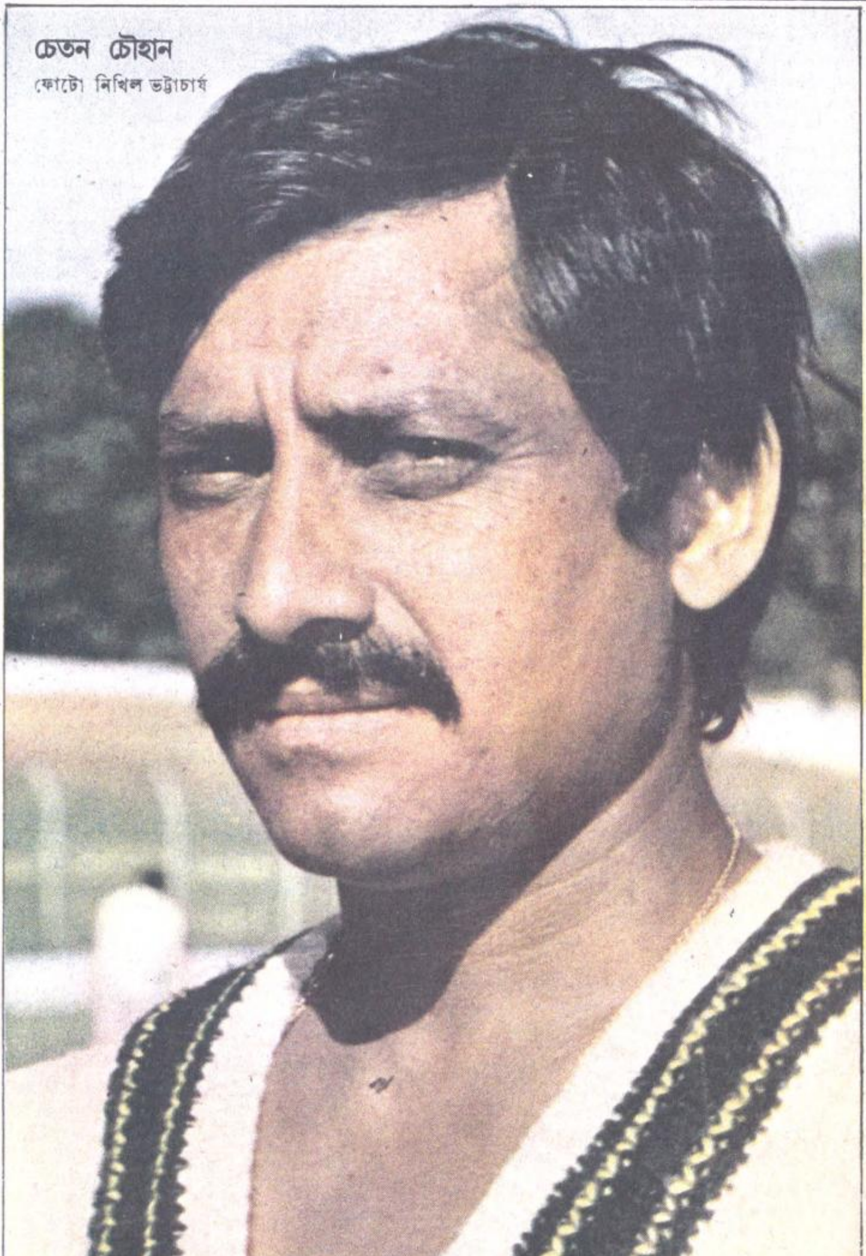

(পাতা ওলটালেই চেতনের খবর)

চেতনের দুর্ভাগ্য

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

অসংখ্য লোক যদি একসঙ্গে একই জায়গায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাহলে কী হয়? ঝড় ওঠে?

জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, গত ২৫ জানুয়ারির সকালের আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠেছিল অসংখ্য ভারতীয়ের দীর্ঘশ্বাসে। যে যেখানেই থাক না কেন, সেদিন কেউ আর রেডিও থেকে দূরে অন্য কাজে যেতে পারছিল না। কী করে যাবে? ভারতের ওপেনার চেতন চৌহানের দুর্ভাগ্যের অবসান হতে চলেছে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে। এবার আর চৌহানকে টেস্ট সেঞ্চুরি থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারছে না—এটা ধরে নিয়ে সকলেই সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু হায়! এবারেও ঠোঁট ও কাপের ব্যবধান রয়েই গেল।

এটাই শুরু নয়। বা শেষও নয়। দুর্ভাগা চৌহান এবার ও তার আগে এবং পরে মিলিয়ে অন্তত আটবার তিন অঙ্কের বাঞ্ছিত জাদু-সংখ্যাটি ছুঁতে-ছুঁতেও ছুঁতে পারেননি। দরজার গোড়ায় গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন। এর মধ্যে দুবার (অ্যাডিলেডের ঐ ৯৭ নিয়ে) তাঁর রান ছিল নয়ের ঘরে, পাঁচবার আটের ঘরে এবং একবার—এই সেদিন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে—সাতের ঘরে। এই তালিকাটিই যথেষ্ট : ১৯৭৭ (পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে) ক গ্যানন বো সিম্পসন ৮৮; ১৯৭৮ (লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে) ক বারি বো মিয়াঁদাদ ৯৩; ১৯৭৮ (বোম্বাইতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে) ক মারে বো প্যারি ৮৪; ১৯৭৯ (ওভালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে) ক বথাম বো উইলিস ৮০; ১৯৭৯ (কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে) ক ইয়ার্ডলে বো ডিমক ৮৪; ১৯৮১ (অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে

চেতন (বল ফসকেছেন)

চেতন (বল মেরেছেন)

—ফোটো বিমল ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় টেস্টে) ক মার্শ বো লিলি ৯৭ ; ১৯৮১ (মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে) ক ইয়ার্ডলে বো লিলি ৮৫ ; ১৯৮১ (ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে) ক স্মিথ বো হ্যাডলি ৭৮।

সবচেয়ে শেষের ঐ টেস্টটি পর্যন্ত চেতন খেলেছেন ৩৯টি, কিন্তু তবুও তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। দেশবাসীরও না। এবং কী আশ্চর্য ! এই আটবারের মধ্যে প্রতিবারই চেতন কট আউট হয়েছেন। জীবনের ৩৯তম টেস্টে চৌহানের ২০০০ রানও পূর্ণ হয়ে গেল—বিনা সেঞ্চুরিতেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেটকীপার ডেরিক মারেও কোনো সেঞ্চুরি না করেই এ-পর্যন্ত বিস্তর রান করেছিলেন। তাঁর রেকর্ডকে ভেঙেছেন চৌহান।

অথচ ঘরোয়া ক্রিকেটে চৌহানের প্রচুর সেঞ্চুরি আছে। রনজি ট্রফিতে মহারাষ্ট্রের হয়ে বিদর্ভের বিরুদ্ধে তিনি ২০৭ করেছিলেন। চৌহানই সেই তিন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন যাঁদের দলিপ ট্রফিতে সমস্ত বিপক্ষ অঞ্চলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি আছে।

আবার, প্রথম উইকেট জুটিতে গাভাসকারের সঙ্গে চৌহানের রেকর্ড আছে—নিউজিল্যান্ড ছাড়া আর সমস্ত টেস্ট খেলা দেশগুলির বিরুদ্ধে ভারতের সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড চেতন-সুনীল জুটির। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২১৩ (ওভাল ১৯৭৯), পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯২ (লাহোর, ১৯৭৮) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯২ (বোম্বাই ১৯৭৯) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৫৩ (বোম্বাই, ১৯৭৮)।

সুতরাং টেস্টে চৌহানের শতরানের দাবিকে অযৌক্তিক বা ভিত্তিহীন বলা যায় না।

চেতেন্দ্রপ্রতাপ সিং চৌহান—হ্যাঁ ওটাই তাঁর আসল নাম এবং 'চেতন' ডাকনাম—জাতিতে রাজপুত। কয়েক শতাব্দী আগে আর-এক রাজপুত, রানা প্রতাপ সিংহ তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি, আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে। ভারতের ক্রিকেট দলের সর্বজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় চেতন (জন্ম ২১ জুলাই ১৯৪৭) কি পারবেন না তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে? আর খুব বেশি সময় তো তিনি পাবেন না।

হ্যাডলি (১৫০ উইকেট)

ক্রাইস্টচার্চে ড্র

অলোক দাশগুপ্ত

ক্যান্টারবেরির প্রধান শহর ক্রাইস্টচার্চ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্র। অতীতের নামী ব্যাটসম্যান এল এ কাফ থেকে শুরু করে আজকের হীরো রিচার্ড হ্যাডলি পর্যন্ত অসংখ্য ক্রিকেটারকে উপহার দিয়েছে এই শহরটি। ১৯৮৪-তে এখানেই জন্ম নেয় নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট কাউন্সিল। টেস্ট-ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের অভিষেকও ক্রাইস্টচার্চের ল্যাঙ্কাস্টার পার্কে—১৯২৯-৩০-এর প্রথম টেস্টটি ইংল্যান্ড অনায়াসে আট উইকেটে জিতেছিল।

নিউজিল্যান্ডের বনেদি ক্রিকেট মাঠ ল্যাঙ্কাস্টার পার্কের বয়স এখন একশো পেরিয়ে গেছে। আগের দুটি সফরে ভারত এই মাঠে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ১৯৬৭-৬৮ সিরিজে পতৌদির নবাব মনসুর আলি খানের দল হেরেছিল ছয় উইকেটে। ক্রাইস্টচার্চবাসীর কাছে ম্যাচটি আরো বেশি স্মরণীয় হয়ে আছে "ঘরের ছেলে" গ্রাহাম ডাউলিংয়ের অনবদ্য ২৩৯ রানের ইনিংসটির জন্য। পাঁচ বছর আগে বিষাণ বেদীর ভারত রীতিমত লড়াই করে ম্যাচ বাঁচিয়েছিল।

এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের শুরু দেখে অবশ্য মনে হয়েছিল ক্রাইস্টচার্চ শেষ

গাভাসকার (নো-বলের রেকর্ড)

পর্যন্ত বুঝি ভারতের প্রতি সদয় হয়েছে। টসে জিতে গাভাসকার প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন এবং চৌহানের সঙ্গে প্রথম উইকেটের জুড়িতে ১১৪ রান যোগ করেন—মেলবোর্নের দ্বিতীয় ইনিংস ছাড়া এ-বারের সফরে ভারতের এত ভাল সূচনা ইতিপূর্বে হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি এবং মন্দ আলো বাদ সাধল। প্রায় সাড়ে তেরো ঘণ্টার মতো সময় নষ্ট হওয়ায় এই টেস্টের ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা উবে গেল।

চতুর্থ দিনের শুরুতেই সবাই ধরে নিয়েছিলেন, দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হচ্ছে। আশা করা গিয়েছিল বাকি সময়টা দুই দলের খেলোয়াড়রা দর্শকদের আনন্দ দিতে চেষ্টা করবেন এবং অকল্যান্ড টেস্টের জন্য ব্যাটিং প্র্যাকটিস করে নেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওঁরা ঘুমপাড়ানি ক্রিকেট খেলেছেন—সবাই একান্তভাবে কামনা করেছেন কখন এই বিরক্তিকর টেস্ট শেষ হবে।

তবে ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট কিছু ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিউজিল্যান্ডের বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান জন ফুলটন রীড ৪১৬ মিনিটে ১২৩ রান করেছেন—জীবনের তৃতীয় টেস্টে তাঁর প্রথম সেনচুরি। ১৯৭৮-৭৯তে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। তেমন সুবিধা করতে পারেননি, রান করেছিলেন ০ এবং ১১। দুই বছর পরে নিউজিল্যান্ড দলে ফিরে এসেছেন। অভিজ্ঞ মার্ক বার্জেস এবং জন পার্কারের অনুপস্থিতি ভারতের বিরুদ্ধে ওয়েলিংটন টেস্টে ২৫ বছর বয়সী রীডের জায়গা করে দিয়েছিল। আশা করা যায় এই শতরানের পর দলে তাঁর স্থান পাকা হবে।

রিচার্ড হ্যাডলি ৪৭ রানে পাঁচ উইকেট পেয়েছেন। গাভাসকারের উইকেট দখল করার পর টেস্টে হ্যাডলির ১৫০ উইকেট পূর্ণ হল। নিউজিল্যান্ডের আর কোনো বোলার এত সফল হননি। টেস্টে ৭৫-এর বেশি উইকেট পেয়েছেন আর মাত্র পাঁচজন—কলিঙ্গ (১১৬), টেলার (১১১), মজ (১০০), হ্যাডলি হাওয়ার্থ (৮৬) এবং প্রাক্তন অধিনায়ক রীড (৮৫)।

চেতন চৌহান তাঁর ব্যক্তিগত ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন, কিন্তু উনচল্লিশতম টেস্টেও আকাঙ্ক্ষিত শতরান পেলেন না—৭৮ রানের মাথায় হ্যাডলির বল কাট করতে গিয়ে উইকেটরক্ষক স্মিথের হাতে জমা দিলেন। চৌহান ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডেরিক মারে সম্ভবত একমাত্র ক্রিকেটার যিনি ২০০০ রান করেছেন কোনো শতরান ছাড়া। রঞ্জিতকুমার ঘোষের লেখাতেই তা তোমরা জেনেছ।

ভারতের অধিনায়ক সুনীল গাভাসকারের দখলে অনেকগুলি ব্যাটিং রেকর্ড রয়েছে। এই টেস্টে বোলিংয়ে তিনি একটা রেকর্ড গড়লেন, —এক ওভারে গাভাসকার পাঁচটি নো-বল করেছেন।

এই প্রথম ভারতীয় দলে একই সঙ্গে দুজন স্পেশালিস্ট বাঁ-হাতি স্পিনারকে খেলতে দেখা গেল। এর আগে অবশ্য দুরানি-নাদকার্নি, সুর্তি-বেদী, সোলকার-বেদী কিংবা ঘাউড়ি-বেদী একসঙ্গে খেলেছেন। দুরানি-নাদকার্নি, সুর্তি-সোলকার ছিলেন অলরাউন্ডার এবং সুর্তি, সোলকার ও ঘাউড়ি মাঝে-মাঝে স্পিন করালেও মূলত তাঁরা পেস বোলার হিসাবে বেশি পরিচিত। বেদী দলে ছিলেন বলে ঘরোয়া ক্রিকেটে ক্রমাগত সফল হওয়া সত্ত্বেও রাজিন্দার গোয়েল বা পদ্মকার শিভালকার ভারতীয় দলে স্থান পাননি। দোশি এবং শাস্ত্রীর একই সঙ্গে দলে থাকা নিঃসন্দেহে এক নতুন ঘটনা এবং কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণও বটে। তবে কি ভারত আবার স্পিন বোলিংয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে?

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

লম্বা বনাম বেঁটে

অশোক রায়

সাধারণত মাথায় যারা একটু উঁচু, তাদের ধারণা, খেলার জন্যে চাই লম্বা শরীর। আর যারা একটু বেঁটে, তাদের বিশ্বাস খেলতে জানলে 'হাইট' ব্যাপারটা কিছু নয়। আসলে লম্বা আর বেঁটেদের মধ্যে এক ধরনের ঝগড়া যেন সবসময় লেগেই থাকে।

আপাতত ঝগড়া থাক, শুধু জেনে রাখো --প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সবচেয়ে দীর্ঘকায় ক্রিকেটারের নাম এ টি সি অ্যালম। তিনি সারে টীমে খেলতেন। উচ্চতা ছিল ছ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি। মাত্র আধ ইঞ্চি কম হাইট ছিল ওয়ারউইকশায়ারের পি ডানকেল্‌সের। সাসেক্সের টনি গ্রেগকে তোমরা অনেকেই ইংল্যান্ডের হয়ে কলকাতায় টেস্ট খেলতে দেখেছ। ও'র উচ্চতা—ছ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি। টেস্ট ক্রিকেটে এত 'উ'চুমাথা' নিয়ে গ্রেগের আগে আর কেউ আসেননি। অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলার গর্ডন রোরকের উচ্চতাও ছিল প্রায় গ্রেগেরই মতো। ইংল্যান্ডের এখনকার ফাস্ট বোলার বব উইলিসও বেশ লম্বা। ও'র নামের আগে 'পাক্কা সাড়ে ছ' ফুট' এই বিশেষণটি অনায়াসে জোড়া যায়। ১৯৭৭ সালে 'অবিশ্বাস্য উচ্চতা নিয়ে' টেস্ট ক্রিকেটে হাজির হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার জোয়েল গারনার। ছ'ফুট আট ইঞ্চি মাপের এই দৈত্যাকার পেস বোলারই এই মুহূর্তে সবচেয়ে দীর্ঘকায় টেস্ট ক্রিকেটার।

বিভিন্ন দেশের হয়ে টেস্টে যাঁরা মোটামুটি দক্ষতা দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দৈর্ঘ্যের কথা ভাবলে যাঁদের বাদ দেওয়া যাবে না, তাঁরা হলেন রিচার্ড কলিঞ্জ (নিউজিল্যান্ড), ওয়েসলি হল (ওঃ ইন্ডিজ), জে সিনক্লেয়ার (দঃ আফ্রিকা), অস্ট্রেলিয়ার এইচ ট্রাম্বল (টেস্টে দুটি হ্যাটট্রিকের নজির আছে)। লক্ষ করলেই বুঝবে যে, লম্বা মাপের ক্রিকেটাররা সাধারণত পেস বোলিংকেই বেছে নেন. সেইজন্যে অধিকাংশ ফাস্ট বোলারই বেশ লম্বা।

এবার খর্বকায়দের কথায় আসি। যে-সমস্ত ক্রিকেটার সাড়ে পাঁচ ফুটের নীচে তাদের মধ্যে প্রথমেই ভারতীয় সুনীল গাভাসকার আর গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের নাম মনে আসবে। পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চির গাভাসকার কিংবা বিশ্বনাথের মতোই ওয়েস্ট ইন্ডিজের রয় ফ্রেডেরিক্স, অ্যালভিন কালীচরণ এবং পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদের হাইট। এ'রা সকলেই নামী ব্যাটসম্যান। তবে এ'দের থেকে কম উচ্চতার মানুষও ক্রিকেট খেলেছেন এবং যথেষ্ট যোগ্যতা সহকারে! ইংল্যান্ড এবং কেন্ট কাউন্টির বিশ্বখ্যাত লেগ স্পিনার এ পি ফ্রীম্যানের (যিনি টিক নামেই বেশ পরিচিত) উচ্চতা ছিল মাত্র পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সারের টি ডব্লু গান্ এবং নর্দাম্পটনের এফ জেকম্যান, দুজনের উচ্চতাই ছিল ফ্রীম্যানের মতো। ক্রিকেটের সবচেয়ে বেঁটে হবার রেকর্ডটা হয়তো এ'দেরই।

টেস্টের আসরে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি মাপের কয়েকজন বিখ্যাত ক্রিকেটার হলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের স্পিনার জে ব্রিগস, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সনি রামাধীন, অস্ট্রেলিয়ার সিড গ্রেগরি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাইটি মাউস কলি স্মিথ। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, কম উচ্চতার ক্রিকেটাররা সাধারণত ব্যাটসম্যান হিসেবে অথবা স্পিনার রূপেই বেশি খ্যাতিলাভ করেছেন। তবে এইখানে অন্তত দুটি নামের ব্যতিক্রম চোখে পড়ছে। ভারতের মিডিয়াম ফাস্ট বোলার রমাকান্ত দেশাইকে মনে আছে? কপিলদেবের আগে এই 'খুদে' দেশাই ছিলেন আমাদের এক নির্ভরযোগ্য পেস বোলার। দেশাইয়ের উচ্চতা ছিল মাত্র পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। প্রায় একই উচ্চতা ছিল ক্রিকেটের বাইবেল 'উইজডেন'-এর স্রষ্টা জন উইজডেনের। মাত্র সাত স্টোন ওজনের এই পেস বোলারটিও কিন্তু 'লিটল ওয়ান্ডার' হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

দীর্ঘকায় এবং খর্বকায় ক্রিকেটাররা ক্রিকেটের নানা আসরে আগেও লড়েছেন, এখনও লড়ছেন। তাই 'লম্বা' এবং 'বেঁটে'দের চিরাচরিত তর্কের ব্যাপারটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী !

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্‌টে এমনই চমক্‌দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে !

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয় । কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী !

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন :

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ

শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থাগার

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.35-1810 BG

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক আহত, তার জায়গায় যুধিষ্ঠির পড়াচ্ছেন। গবার ঘরে মাঝরাত্তিরে যে ঢুকেছিল, তার মুখে জর্দার গন্ধ। যুধিষ্ঠিরও জর্দাপান খান। সার্কাসে যে-লোকটা মুখোশ পরে রোমহর্ষক খেলা দেখায়, গোপনে তার পরিচয় জানতে তাঁবুতে ঢুকে দারোগা আক্রান্ত। সকালে তাঁবুতে ঢুকে গবা জানায়, গোবিন্দ মাস্টার খড়ের গাদায় পৌঁছেছে। কাকাতুয়া বলে, রামু, "পড়তে বোসো।" রামু পাখিকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে ঠোঁটের ঠোক্কর খায়। বাবাও তাকে বেত মেরেছেন তারপর....

॥ ১১ ॥

অনেক ভেবে চিন্তে গাণ্টু বলল, 'আমি সারকাসে যাব না। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে চাকরি নিয়ে দুনিয়া ঘুরে বেড়াব।"

রামু বলে, "জাহাজে চাকরি পাওয়া অত সোজা নয়। তোকে নেবে কেন? তুই সাঁতার জানিস?"

"শিখে নেব। তোকে সারকাসে নিলে আমাকেও জাহাজে নেবে।"

"তাহলে পালাবি?"

"পালাব। কিন্তু গাড়িভাড়ার কী হবে? রাস্তায় খাব কী?"

"সে হয়ে যাবে। আমি তো সারকাসের দলের সঙ্গে যাচ্ছি, আমাকে ওরাই খেতে-টেতে দেবে।"

"আমি যদি তোর সঙ্গে থাকি তো আমাকেও নেবে?"

"সেটা এখুনি বলতে পারছি না। কথা বলতে হবে।"

ক্লাসের ফাঁকে-ফাঁকে গাণ্টুর সঙ্গে নানারকম পরামর্শ করে রামু বাসায় ফিরল। সারাদিন খাওয়া নেই। টিফিনে গাণ্টু একটু চিনেবাদামের ভাগ দিয়েছিল মাত্র। তাতে খিদেটা আরো চাগিয়ে উঠেছে। পেটের আগুনটা রাগের হল্কা হয়ে মাথায় উঠে আসছে। বইটই রেখে রামু নিঃসাড়ে গিয়ে বাগানে ঢুকল। বাগানের এক কোণে একটা কুলগাছ আছে। তাতে মস্ত-মস্ত টোপাকুল হয়েছে। ইচ্ছে ছিল, পেট ভরে কুল খেয়ে খিদেটা চাপা দেবে।

কিন্তু গিয়ে দেখে, কুন্দ দারোগার দুই ছেলে আন্দামান আর নিকোবর চুরি করে বাগানের দেয়াল টপকে ঢুকে গাছে উঠে কুল সব সাফ করছে। একজনের হাতে আবার একটা বাঁশের চ্যাঙাড়ি। সেটা টোপাকুলে টুপটুপে ভর্তি।

রামু হাঁক মারল, "অ্যাই! আমাদের গাছে উঠে কুল পাড়ছিস যে বড়!"

কুন্দকুসুমের শাসন বড্ড কড়া। কুল চুরির কথা জানাজানি হলে আস্ত রাখবেন না। ভয়ের ব্যাপার আরো আছে। রামুর ঢিল ছোঁড়ার হাত দারুণ পাকা। এখন নীচ থেকে সে যদি ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে তবে গাছের ওপর দুই ভাইয়ের বড়ই বিপদ। রামুর ঢিল বড় একটা ফশকায় না। তাই দুই ভাই ওপর থেকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, "বলিস না, ভাই, বলিস না। অন্যায় হয়ে গেছে। তোকে অর্ধেক দিচ্ছি। পায়ে পড়ছি, ঢিল মারিস না।"

খিদে-পেটে রামুর গাছে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া এ-বাড়ির ওপর তার এখন এমন রাগ যে, এই বাড়ির কোনো ক্ষতি হলে সে খুশিই হয়। সে গম্ভীর হয়ে বলল, "ঠিক আছে, নেমে আয়।"

আন্দামান আর নিকোবর পকেটে করে কাগজের পুরিয়ায় অনেকটা ঝাল-নুন এনেছে। তাই দিয়ে গাছতলায় তিনজনে কুলের ভোজে বসে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে তিনজন কুল খেয়ে গেল। পাকা, আধ-পাকা ডাঁশা কুল আর দুর্দান্ত ঝাল-নুন খেতে-খেতে চকাস-চকাস শব্দ আর ঝালের শোঁসানি শোনা যাচ্ছিল কেবল। তারপর নিকোবর বলল, "তুই নাকি সারকাসের দলে ভিড়ছিস?"

রামু কথাটা আর কাউকে বলেনি, গাণ্টু

ছাড়া। তাই চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে বলেছে?"

"গান্টু। স্কুল থেকে ফেরার পথে বলল, রামু সারকাসের দলে চলে যাচ্ছে।"

আন্দামান মুখ থেকে একটা কুলের বিচি ফুড়ুক করে ফেলে বলল, "ওই সারকাসে একটা সাঙ্ঘাতিক খুনি লোক আছে। দিনে-দুপুরে মানুষ খুন করে।"

রামু বলে, "কে বল তো!"

"যে-লোকটা আজকাল সাপের খেলা দেখায়। মাস্টার লখিন্দর।"

"লোকটা খুনি কী করে জানলি?"

"বাবা গতকাল ফন্তুবাবুকে বলছিল, আমি আড়াল থেকে শুনেছি।"

"ফন্তুবাবুটা কে?"

"পুলিসের ইনফর্মার।"

"কী বলছিল?"

"বলছিল লখিন্দরের নাম নাকি আসলে লখিন্দর নয়। এ হচ্ছে মাস্টার গোবিন্দ। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই বলে একটা লোককে খুন করে জেলে যায়। তার ফাঁসির হুকুমও হয়েছিল। কিন্তু লোকটা জেল থেকে পালিয়ে এসেছে।"

"তবে তোর বাবা তাকে ধরছে না কেন?"

"ধরা যাচ্ছে না। লোকটা মুখোশ পড়ে নামে তো। আসল চেহারাটা কেউ দেখেনি। সারকাসওয়ালারা অন্য একটা লোককে দেখিয়ে বলছে, এই হচ্ছে মাস্টার লখিন্দর।"

"তাহলে তোর বাবা এখন কী করবে?"

"কিছু করবে না। শুধু ওয়াচ করা হবে। মাস্টার গোবিন্দর সব খোঁজ-খবর চেয়ে পাঠানো হয়েছে। পুলিস ফোর্সও আসছে। শহরটা ঘিরে ফেলা হবে। এখন ইনফর্মার আর সেপাইরা চারদিকে নজর রাখছে। গত-কাল থেকে সারকাসে সাপের খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। বিরাট নোটিস টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে—মাস্টার গোবিন্দ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। সাপের খেলা বন্ধ রইল। সব প্ল্যান করা।"

আর কয়েকটা কুল খেয়ে রামু উঠে পড়ল। আন্দামান আর নিকোবর তাকে অর্ধেক কুলের ভাগ দিতে চাইলে রামু ঠোঁট উল্টে বলল, "তোরা নিগে যা।"

সন্ধেবেলা গবা পাগলার ঘরে গিয়ে তাকে ধরল রামু, "গবাদা! শুনেছ হবিবগঞ্জের সার-কাসের সেই সাপ-খেলোয়াড় লখিন্দর নাকি আসলে খুনি?"

অন্যমনস্ক গবা বলল "হ্যাঁ, খুব গুণী।"

"গুণী নয় গো, সে নাকি খুনি।"

গবা অবাক হয়ে বলে, "তোমাকে কে বলল?"

"আন্দামান আর নিকোবর। কুন্দ দারোগার যমজ ছেলেরা।"

"বটে!" বলে গবা আঙুল দিয়ে তার দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, "খুন একটা হয়েছিল বটে। সেই কাশিমের চরে। গেলবারের আগের বারে শীতকালে। জায়গাটা এখান থেকে খুব দূরেও নয়। বিশ-পঁচিশ ক্রোশ হবে। খুব জ্যোৎস্না ছিল সেই রাতে।"

"তুমি সেখানে ছিলে?"

"খানিকটা ছিলাম বই কী। কাশিমের চরেই যে সেই রাতে তেনাদের নামবার কথা।"

"কাদের?"

"আলফা সেনটর হল সৌরলোকের সবচেয়ে কাছাকাছি নক্ষত্র। দূরত্ব হবে চার আলোবছর। সেখানকার একটা উন্নত গ্রহের সঙ্গে আমার অনেকদিনের যোগাযোগ। বহুকাল খবর-বার্তা দিইনি বলে চিন্তা করছিল তারা। আমাকে একদিন একটা ভাব-সংকেত পাঠাল। যন্ত্রপাতি দিয়ে নয়, স্রেফ জোরালো মানসিক প্রক্রিয়ায়। জানান দিল, দিন-দুইয়ের মধ্যেই তারা এক পূর্ণিমার রাতে কাশিমের চরে নামবে। আমি যেন সেখানে হাজির থাকি।"

"গুল মারছ গবাদা!"

"গবা তো কেবল গুলই মারে। আর বলব না, যাও।"

"আচ্ছা আচ্ছা, গুল নয়। বলো।"

"শেষ পর্যন্ত অবশ্য সময়মতো তারা আসতে পারেনি। পরে শুনলাম ওদের মহা-কাশযানের একটা মাস্তুল নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

"মাস্তুল তো নৌকোয় থাকে।"

"আরে বাবা, এ কি আর সাধারণ মাস্তুল! এই মাস্তুল হল আসলে একটা সুপারসেনসিটিভ স্ক্যানার।"

"যাকগে, তারপর কী হল?"

"সে এক কাণ্ড। আমি তো কাশিমের চরে জ্যোৎস্নায় একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমে ঢুলে পড়ছি। কখন তেনারা আসবেন। কাশিমের চর জায়গাটা বড় ভাল নয়। একধারে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে নদী; শীতকাল বলে জল প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। দু ধার দিয়ে তিরতির করে নালার মতো দুটো স্রোত বয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে মস্ত চর। তা সেই চরেও আবার কাশফুলের ঘন ঝোপ সব। মাঝখানে অবশ্য অনেকটা জায়গা ফাঁকা। সন্ধের পরই সোনার থালার মতো চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় একেবারে মাখামাখি। আর যা শীত পড়েছিল সেবার, তা আর বলার নয়।"

"উঃ, প্রকৃতি-বর্ণনা রেখে আসল গল্পটা বলবে তো!"

"তোমার বাপু বড্ড ধৈর্য কম। গল্পের আসল প্রাণই তো ঐ প্রকৃতি আর পরিবেশের ওপর। ওটা না হলে গল্পটা বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া হয়ে যায় যে। সত্যি বলে মনে হয় না।"

"তারপর কী হল?"

"সে এক কাণ্ড। আমি তো সেই শীতে একেবারে জড়সড়ো হয়ে ঠাণ্ডা মেরে বসে আছি। চারদিকে বেশ কুয়াশা। কুয়াশার মধ্যে জ্যোৎস্নার একটা আলাদা রূপ আছে। গোটা জায়গাটাকে মনে হচ্ছিল পরীর রাজ্য। দেখতে-দেখতে রাত বেড়ে উঠল। ঘুমে আমি ঢুলে পড়ছি। এমন সময় মনে হল একটা লোক যেন দূর থেকে দৌড়ে আসছে। বালির ওপর তো পায়ের শব্দ হয় না। কিন্তু আমি সেই মহাকাশের লোকগুলোর ভারসংকেত পাওয়ার জন্য মনটাকে এমন চনমনে রেখেছিলাম যে, ছুঁচ পড়লেও শব্দ শুনতে পাব।"

"তবে এই যে বললে ঘুমে ঢুলে পড়ছিলে!"

"তা বটে। তবে কিনা সে-ঘুমও ভাবের ঘুম। চোখ বোজা থাকে বটে; কিন্তু কান, গায়ের চামড়া, নাক, চারদিকের খবর পায়।"

"লোকটা দৌড়ে কোথায় গেল?"

"গেল না। লোকটা আসছিল। আমি চোখ চেয়ে কুয়াশায় কাউকে দেখতে পেলাম না। তবে কয়েক সেকেণ্ড পরেই আরো চার-পাঁচজনের দৌড়ে আসার আওয়াজ পেলাম। তারপর বুঝলাম প্রথম লোকটা পালাচ্ছে, পরের লোকেরা তাকে তাড়া করছে। প্রথম পায়ের শব্দটা ঝোপের আড়ালে-আবডালে বেড়ালের মতো চুপি চুপি ঘুরে বেড়াচ্ছে, গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্য লোকগুলো তাকে খুঁজছে।"

"তুমি কী করলে?"

"আমি একটা হাই তুললাম তখন।"

"মাত্র হাই তুললে?"

"না, দুটো তুড়িও দিয়েছিলাম মনে আছে।"

"ধুস, তারপর কী হল?"

"ওঃ, সে এক কাণ্ড!" (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

ছোটদের যত সেরা বই

সন্তোষকুমার ঘোষ রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট গদ্যকার। আকাদেমি পুরস্কার-পাওয়া এই লেখক বড়ো বেশি ব্যস্ত ছিলেন বড়োদের নিয়ে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি এমন একটি বই লিখেছেন যা একান্তই কিশোর মনের। বইটি হল—'দুপুরের দিকে'। কিশোর বলতে তারা, যারা এই প্রথম জীবনের জটিলতার আশ্বাস নিতে শুরু করেছে, সকালবেলা থেকে যারা পা বাড়িয়েছে দুপুরের দিকে। বয়ঃসন্ধির দারুণ সময়ে এই বই পড়ে তাদের মনে হবে, এই তো সেই কথা, যা বস্তুতপক্ষে আমারও। ভেতরে চমৎকার সব এঁকেছেন দেবাশিস দেব। প্রচ্ছদ এঁকেছেন বিপুল গুহ।

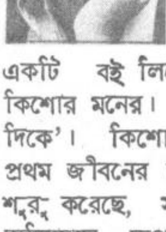

আনন্দ বাগচী তাঁর 'বনের খাচায়' উপন্যাসে পুপে নামে এমন একটি ছেলের কথা লিখেছেন. যে কিনা জাতিস্মর। জাতিস্মর বলে তাকেই, আগের জন্মের ঘটনা যার মনে রয়েছে। পুপে ছিল তেমনই একজন। পুপের মামা চিড়িয়াখানার অফিসার। পুপে গিয়েছিল মামার বাড়িতে বেড়াতে। সেখানে একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি হল। পুপে আর তার মামাতো বোন কীভাবে উদ্ধার করল সেই ডাকাতির রহস্য এবং জাতিস্মর পুপের কত সব অদ্ভুত স্মৃতি মনে পড়ে গেল তাই নিয়েই এই দারুণ মজাদার ও রোমাঞ্চকর রহস্য-উপন্যাসটি লিখেছেন আনন্দ বাগচী।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ গোঁসাইবাগানের ভূত ৮ **গৌরকিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক ৫ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৫ **আশাপূর্ণা দেবীর** রাজকুমারের পোশাকে ৪ গজ উকিলের হত্যা রহস্য ৮ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ বন্ধ ঘরের আওয়াজ ১০ **অমিতাভ চৌধুরীর** তেপান্তরের মাঠে ৪ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ রাত একটা ৪ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ দাশরথির বাহাদুরি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মঞ্জিল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৬ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্পো ১২ আরো এক ডজন ১২ ফটিকচাঁদ ৮ **পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ মাধুরীলতার গল্প ৬ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ ক্রিস্টাল ১০ **অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের** সূর্যপথিক শ্রীঅরবিন্দ ৮

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

ব্যুমেরাং

মঞ্জিল সেন

খোকনের চোখের সামনেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। তখন পড়ন্ত বিকেল, ও রাস্তা পার হবার জন্য অপেক্ষা করছিল। একে ছুটির দিন, তার ওপর টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, পথে লোকজন তেমন নেই। তা ছাড়া এ দিকটা এমনিতেই একটু নির্জন, আগে এটা ছিল সাহেবপাড়া।

একটা বাস চলে গেল। বাস থেকে নামল গাঢ় লাল রঙের জামা আর বেল-বটম পরা একটি যুবক। যুবকটি এক পা বাড়িয়েছে অমনি কোথা থেকে ছুটে এল আরেকজন ছেলে। কেউ কিছু বোঝবার আগেই সে একটা ডান্ডা বসিয়ে দিল যুবকটির মাথায়। একটা চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল যুবকটি। গুন্ডাটি বোধহয় আরও আঘাত করত, কিন্তু তার আগেই একজন বলিষ্ঠ ভদ্রলোক ছুটে গেলেন, এক ঘুষি মারলেন তাকে। মস্তান ছেলেটি পড়তে-পড়তে কোনোমতে সামলে এক ছুটে পাশের এক গলিতে ঢুকে পড়ল। ভদ্রলোক উপুড় হয়ে আহত যুবকটিকে দেখছেন, ঠিক এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়াল পুলিসের কালো রঙের গাড়ি।

ঝটপট গাড়ি থেকে নামলেন একজন ইন্সপেক্টর, আর দুজন কনস্টেবল। ইন্সপেক্টরের হুকুমে ভদ্রলোককে জাপটে ধরল কনস্টেবল দুজন। ভদ্রলোক বলে উঠলেন,— "আরে, আমাকে ধরছেন কেন! যে মেরেছে সে তো পালিয়েছে, আমি একে সাহায্য করতে এসেছিলাম।"

''তাই বুঝি! না, আমাদের দেখে সাহায্যের অভিনয় করা হচ্ছিল?'' ঠেস দিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর, ''ওসব ভণিতা পরে হবে. আগে থানায় চলুন তো।"

খোকন আর পারল না, এগিয়ে গেল, ইন্সপেক্টরকে লক্ষ করে বলল, ''উনি সত্যি কথাই বলছেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

ইন্সপেক্টর ভুরু কুঁচকে তাকলেন ওর মুখের দিকে, তারপর ধমকের সুরে বললেন, "তোমাকে কেউ সাক্ষী মানেনি, তোমার মতামতও চাওয়া হয়নি।"

"কিন্তু উনি সাহায্যের জন্য ছুটে না এলে লোকটা আরও মারত, উনিই বাঁচিয়েছেন..."

"তবু কথা বলে!" গর্জন করে উঠলেন

ইন্সপেক্টর, ''তোমাকেও চালান করে দেব। তখন কেঁদে কূল পাবে না।"

"বা রে!" খোকন অবাক হয়ে যায়। "যে দোষ করল, তাকে আপনারা ধরবার চেষ্টা করছেন না. আর যে দোষ করেনি, তাকেই আপনারা হেনস্তা করছেন। সব দেখেও আমি চুপ করে থাকব ?"

রাগে ইন্সপেক্টরের মুখ লাল হয়ে উঠল। খোকনকে প্রায় একটা চড় মারতে যাচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে ওর বুকের কাছের জামাটা চেপে ধরে ওকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন গাড়ির কাছে। বললেন, "চলো, তোমাকে এমন দাওয়াই দেব জীবনে আর কখনও তুমি পুলিসের মুখের ওপর কথা বলবে না।''

আহত যুবকটিকে আগেই গাড়িতে তোলা হয়েছিল। খোকন আর ওই ভদ্র-লোককে তুলে গাড়ি ছেড়ে দিল।

থানায় ওদের দুজনের নামেই ডায়েরি হল। অভিযোগ—হত্যার চেষ্টা। ভদ্রলোক প্রধান আসামী। খোকন তার সহকারী। খোকনের খুব রাগ হচ্ছিল, ও ইচ্ছে করেই ওর নাম, ধাম, পরিচয় ভুল বলল। ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় ও দেখতে চায়। আহত যুবকটিকে অবশ্য আগেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সৌভাগ্যের কথা আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

সারা রাত ওদের কাটল লক-আপে। ওদের প্রতিবাদ কিংবা কোনো কথায় কেউ কান দিল না। এমন-কী, ওই ভদ্রলোক একটা ফোন করতে চেয়েছিলেন, তাও করতে দেওয়া হল না। লক-আপে, অর্থাৎ স্বল্পপরিসর একটা কুঠুরিতে, চোর, পকেটমার, ডাকাত, খুনে সবার সঙ্গে গাদাগাদি করে রাত কাটাতে হল। একে ভাদ্দরের ভ্যাপসা গরম, বড়-বড় মশা, তার ওপর একসঙ্গে ঠাসা অত লোক, সে এক অসহনীয় অবস্থা।

ভদ্রলোক একবার খোকনকে বললেন, "আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি মিছিমিছি বিপদে পড়লে।"

"আপনিও তো একজনকে বাঁচাতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন,'' খোকন জবাব দিল।

সারা রাত যে কীভাবে কাটল, তা খোকন নিজেই জানে না। খিদে, গরম, দুশ্চিন্তা দুর্গন্ধ সব মিলিয়ে যেন নরকবাসের অভিজ্ঞতা। তার মধ্যেই ও ঘুমে ঢুলে-ঢুলে পড়ছিল।

ভোর হল। দশটার পর ওদের আদালতে হাজির করা হবে। এক সুযোগে খোকন থানার একজনকে বলল, ও বাড়িতে একবার ফোন করতে চায়। সারা রাত ও বাড়ি ফেরেনি, ওর মা-বাবা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছেন।

নরম-নরম চেহারার একজনকে বেছে খোকন কথাটা বলেছিল, ওর কেন যেন মনে হয়েছিল লোকটির বোধহয় একটু দয়ামায়া আছে। লোকটি ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল। খোকনের কচি বয়স, শুকনো মুখ আর অবস্থা বিবেচনা করে সত্যিই বোধহয় তার মনে দয়া হল। খোকনকে সে টেলিফোন করার অনুমতি দিল।

একবারের চেষ্টাতেই বাড়ির নম্বর পেয়ে গেল খোকন। ফোন ধরেছেন ওর মা। ওর গলা শুনে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি বললেন, "তুই কোথা থেকে কথা বলছিস ? সারা রাত কোথায় ছিলি ?"

খোকন মাকে জানাল কোন্ থানা থেকে ও ফোন করছে। ওকে কাল সারা রাত লক্-আপে রাখা হয়েছিল, সে-কথা জানাতেও ভুলল না। বাবা যেন এখুনি চলে আসেন।

মিনিট পনরো পরে একটা গাড়ি এসে থামল থানার সামনে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন কাঁচাপাকা-চুল রাশভারী এক ভদ্রলোক। তাকে দেখে থানার সবার চক্ষু চড়কগাছ। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রলোক কোনো দিকে না তাকিয়ে গট্‌গট করে থানার অফিসারের ঘরে ঢুকলেন। অফিসার তখনও ওপরে তাঁর কোয়ার্টার থেকে নামেননি। ভদ্রলোক হুকুম করলেন তাঁকে খবর দেবার জন্য। মিনিট দুইও কাটেনি, সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তর্ করে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন থানার অফিসার। ঘরে ঢুকে দু হাত কচলাতে-কচলাতে বললেন, "স্যার আপনি···!"

''গতকাল চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি ছেলেকে আপনারা থানায় আটকে রেখেছেন ?"

''আজ্ঞে...:'' অফিসার মাথা চুলকোলেন।

''হ্যাঁ কি না, জবাব দিন'' ভদ্রলোকের গলার স্বর হিমশীতল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কী তার অপরাধ?"

"আজ্ঞে..."

"কী তার অপরাধ?" ভদ্রলোকের গলার স্বর এবার লাফিয়ে দু'পর্দা উঠল।

"আজ্ঞে একটা হত্যার চেষ্টায় সাহায্য করা..."

"হত্যার চেষ্টায় সাহায্য করা! ভদ্রলোক যেন বিস্ময়ে থ' বনে গেলেন, তারপরই বললেন, ''কেস-বুকটা নিয়ে আসুন, ডায়রিতে কী লেখা আছে আমি দেখতে চাই।"

অফিসার প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, ছুটেই তিনি আবার ঘরে ঢুকলেন, কেস-বইটা তুলে দিলেন ভদ্রলোকের হাতে। ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়ে নির্দিষ্ট পাতায় চোখ বুলোলেন, তারপর বললেন, "ছেলেটিকে নিয়ে আসুন।"

খোকনকে ঘরে আনা হল। সারা রাত দুর্ভোগে ওর ফর্সা মুখে কালো ছোপ পড়েছে। ভদ্রলোক এক মুহূর্ত নিঃশব্দে ওর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "কী হয়েছিল সব খুলে বল্ তো।"

খোকন প্রথম থেকে যা ঘটেছিল গুছিয়ে বলল, ও এখন নিশ্চিন্ত।

"হুম!" ভদ্রলোক গলা দিয়ে একটা শব্দ করলেন তারপর খোকনের সঙ্গী ভদ্রলোককে ওখানে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। সেই ভদ্রলোক যা বললেন, তা খোকনের বক্তব্যের সঙ্গে হুবহু এক।

যে-ইন্সপেক্টর ওদের ধরে এনেছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি এলেন ওখানে। তাঁকে দেখেই খোকন বলে উঠল, "বাবা, এই সেই ইন্সপেক্টর।''

খোকনের মুখে 'বাবা' ডাক শুনে অফিসার আর ইন্সপেক্টরের চোখ-মুখের যে অবস্থা হল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় খোকনের বাবা প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি নিজের চোখে দেখেছিলেন যে, এই ভদ্রলোক ডান্ডা মেরেছেন এবং এই ছেলেটি ওঁকে সাহায্য করেছে?"

''স্যার...ছেলেটি যদি একবার বলত আপনি ওর বাবা...''

"শাট-আপ," ইনসপেকটারের কথা শেষ না হতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন খোকনের বাবা। "বাপের পরিচয় দিয়ে তবে ওকে ন্যায়বিচার পেতে হবে! কেন। কোথায় আপনারা দুষ্টের দমন করবেন, না ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছে বদনাম কুড়োচ্ছেন!"

"এ-বারকার মত ক্ষমা করুন স্যার," ইন্সপেক্টরের প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা।

"আপনাকে ক্ষমা করা মানে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। তা আমি হতে দিতে পারি না," গম্ভীর কন্ঠে বললেন খোকনের বাবা। "আজ যদি এ আমার ছেলে না হত, তবে বিনা দোষে ওকে হয়তো জেল খাটতে হত, জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেত, এ-কথা একবারও ভেবে দেখেছেন!'' তারপর থানার অফিসারের দিকে ফিরে বললেন, "এরা দুজন এই অফিসারের বিরুদ্ধে কেস করবে, আপনি এদের অভিযোগ ডায়েরি করে নিন, ওকে সাসপেন্ড করার হুকুমও আজ পেয়ে যাবেন।"

''স্যার!'' ইন্সপেক্টর এবার ভেঙে পড়লেন।

"গেট আউট!" গর্জন করে উঠলেন খোকনের বাবা।

আজ আর আকাশে মেঘ নেই, সূর্যের আলো খোকনকে যেন অভিনন্দন জানাল। বাবার সঙ্গে ও গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ওই ভদ্রলোকও ওদের সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিলেন। খোকনের বাবা তাঁকে বললেন, "আপনি কোথায় যাবেন?" চলুন, পোঁছে দিই।"

"তার দরকার হবে না, আমি ট্যাক্সি করে চলে যাব। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।" ভদ্রলোক জবাব দিলেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন "কিছু যদি মনে না করেন, আপনার পরিচয় জানতে পারি?"

খোকনের বাবা খোকনের মুখের দিকে তাকালেন, দুজনের মুখেই যেন দুষ্টুমির হাসি। তারপরই খোকনের বাবা একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন, এদিক-ওদিক তাকালেন, মুখটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে যেন একটা গোপন কথা বলছেন এমনভাবে চাপা গলায় বললেন, ''আমি হলাম গিয়ে পুলিস কমিশনার।''

ছবি দেবাশিস দেব

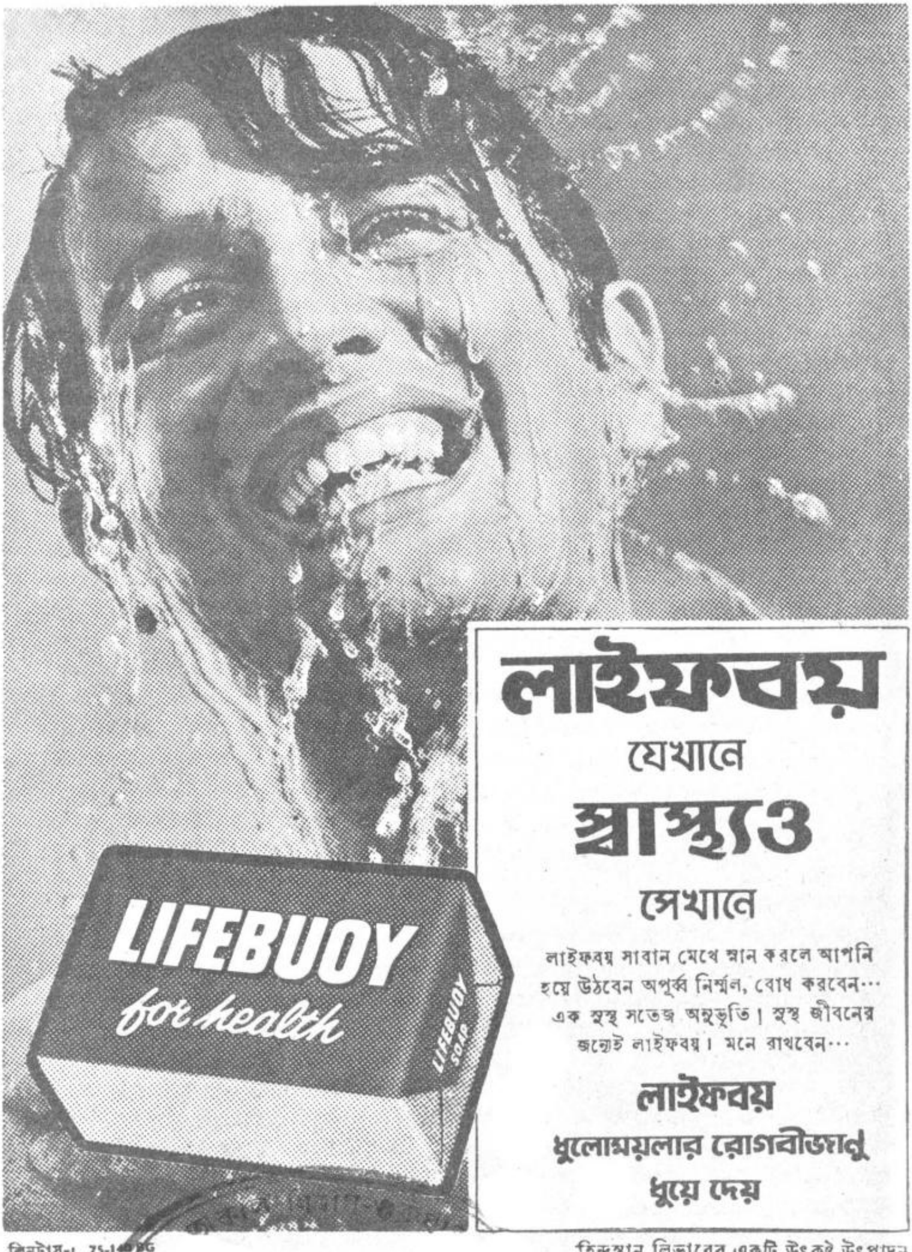
LIFEBUOY
for health
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও
সেখানে
লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করলে আপনি হয়ে উঠবেন অপূর্ব্ব নির্ম্মল, বোধ করবেন··· এক সুস্থ সতেজ অনুভূতি। সুস্থ জীবনের জন্যেই লাইফবয়। মনে রাখবেন···
লাইফবয়
ধুলোময়লার রোগবীজাণু
ধুয়ে দেয়
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ভয়

অনীশ দেব

বোর্ডিংটা দেখে দুলির একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু উপায় নেই। বাবা নিজে এসে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন। বার বার বলেছেন, "কলকাতায় থাকলে তোমার একটুও লেখাপড়া হবে না। তাছাড়া, আমারও বদলির চাকরি; আর সেন্ট মেরিস বোর্ডিং স্কুলের যথেষ্টই নাম আছে। অংশুকাকুর মেয়েও তো ওখানে থেকেই পড়ে। কী দারুণ রেজাল্ট করে প্রত্যেকবার।" ...ব্যস্, এরপর আর কথা চলে না। দুলি মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। খালি ভেবেছে, যে মা ওকে এত ভালবাসে, সেই মা-ও অমন চুপ করে রয়েছে কেন? বলবে তো, আদরের মেয়েকে আমি এক মুহূর্তও কাছ-ছাড়া করতে পারব না! কিন্তু বৃথাই আশা। সুতরাং মা-বাবার সঙ্গে গাড়ি করে দুলিকে রওনা হয়ে পড়তে হয়েছে। লক্ষ্য সেন্ট মেরিস কনভেন্ট। কলকাতা থেকে গাড়িতে মাত্র ঘন্টা দুয়েকের পথ, সবুজ গাছপালাময় শহরতলি এলাকা।

বোর্ডিংয়ে পৌঁছে বাবা দুলিকে নিয়ে গেলেন প্রিন্সিপাল মিসেস হুবার্ডের ঘরে। কথাবার্তা আগে থেকে বলাই ছিল। অতএব দুলি ভর্তি হয়ে গেল ক্লাস সেভেনে। মিসেস হুবার্ড আশ্বাস দিলেন, তাঁর স্কুলে দোলনচাঁপা দাশগুপ্তের কোনো অসুবিধেই হবে না; সুতরাং ওর বাবা-মায়ের কোনো চিন্তা নেই। কথাবার্তা শেষ করে বিদায় নিয়ে মা, বাবা দুজনেই চলে গেলেন। কান্না চেপে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল দোলনচাঁপা। যাবার সময় মা বললেন, "ক-দিন বাদেই

আমরা তোকে আবার দেখতে আসব। কাঁদিস না।" এতে দুলির আরো কান্না পেয়ে গেল। ও ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

বোর্ডিংয়ে দু-চারটে দিন মানিয়ে নিতে না-নিতেই দুলি "দুঃসাহসী সঙ্ঘ"'র খবর পেল। "দুঃসাহসী সঙ্ঘ" সত্যিকারের দুঃসাহসী মেয়েদের নিয়েই। এর নেত্রী সুচরিতা। ক্লাস নাইনে পড়ে। ইস্কুলের শেষে সন্ধেবেলা দুঃসাহসী সঙ্ঘের মেয়েরা সুচরিতার ঘরে জমায়েত হয়। নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করে ওদের পরবর্তী দুঃসাহসিক কাজ কী হবে। যেমন, ইংলিশের টীচার মিস গোমেজকে কিছুটা শায়েস্তা করা যায় কি না; অথবা, ক্লাস নাইনে যে ইদানীং বই-খাতা চুরির হিড়িক লেগেছে সেই চোরকে কীভাবে ধরা যায়—এইসব। সুচরিতার ঘরের এই মিটিংয়ে শুধুমাত্র মেম্বাররাই উপস্থিত থাকে। কারণ বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এসব ঘটনা দুলি প্রথম শুনতে পায় ওরই ক্লাসের শমিতার কাছে। শমিতা দুঃসাহসী সংঘের সভ্যা, সুতরাং দুলি ওকে জিজ্ঞেস করে, "আমাকে তোদের ক্লাবের

যেখানেই যান, যে-কাজই করুন
স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা-হাঁটার উপরই
নির্ভর করছে আপনার সাফল্য।

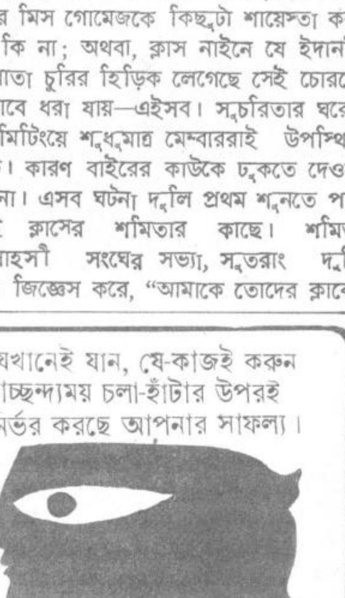

রাজুর তৈরী টেকসই গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া,
মোজাই আপনাকে জোগাতে পারে
সেই বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য, এবং কম
খরচে। কেনার সময় খোঁজ করবেন-

১। প্রেসটিজ রঙীন জাঙিয়া
২। রঙীন ড্রয়ার্স
৩। ভাস্কর জাঙিয়া
৪। ফেন্দার-ফিট রিব গেঞ্জী
৫। ইজিপসিয়ান গেঞ্জী
৬। কুলফিল গেঞ্জী

RAJU

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া
মোজার রাজা

মেম্বার করে নে না—"

উত্তরে শমিতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছে, "অত সহজ নয়; আগে তোকে একটা সাঙ্ঘাতিক সাহসের কাজ করতে হবে, তাহলে—"

দোলনচাঁপা অবাক হয়ে শমিতার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তখন শমিতা বলল, "আমাদের ক্লাবে ঢুকতে গেলে কোনো টাকা-পয়সা লাগে না। শুধু ভীষণ সাহসের কোনো কাজ করে দেখাতে হয়।" একটু থেমে ও আবার বলেছে, "জানিস, আমি রাত্তিরবেলায় ইস্কুলগ্রাউন্ডের পেছনে যে পুকুরটা আছে সেটা সাঁতরে পার হয়েছি, তারপর সুচরিতাদি আমাকে মেম্বার করেছে—"

শুনে দুলি এতটুকু দমেনি। একে তো হোস্টেলে এসে মন খারাপ ছিল, তার ওপর বাবা-মায়ের প্রতি অভিমানবশে ও ঠিকই করে ফেলল, যা হয় হবে। যে-কোনো দুঃসাহসের পরীক্ষা দিতে ও রাজি আছে। দুঃসাহসী সঙ্ঘের দলে ও যেমন করে হোক নাম লেখাবেই। শমিতা উৎসাহ নিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমি তাহলে আজ সুচরিতাদিকে বলে রাখব—"

সেই রাতের মিটিংয়েই সব ঠিক হয়ে গেল।

শমিতার কাছে দোলনচাঁপার ইচ্ছের কথা জানতে পেরে সুচরিতাদি ওকে ডেকে পাঠিয়েছে ওদের মিটিংয়ে। গোটা হোস্টেলের মধ্যে মাত্র পাঁচজন এ পর্যন্ত দুঃসাহসী সঙ্ঘের মেম্বার হতে পেরেছে। দুলি হতে চলেছে ছ নম্বর। বিরাট সম্মান। ফলে ওর বুকটা একটু ঢিপ-ঢিপ করবে সে আর আশ্চর্য কী! সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক হল, মোটা-মুটি সহজ কাজই করতে বলা হবে দুলিকে। ইস্কুল-এলাকার পশ্চিম দিকে খানিকটা হালকা জঙ্গল মতো আছে। তারই কাছাকাছি রয়েছে ইস্কুলের ছোট্ট সুন্দর সুইমিং পুল। শোনা যায়, বছর দশেক আগে ঐ অশথ-দেবদারু-পাম গাছের সমারোহের মধ্যে একজন বুড়ি আয়া গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার পর থেকেই ওই দিকে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না— বিশেষ করে সন্ধের পর। আয়া আত্মহত্যা করেছিল একটা অশথ গাছের ডালে ফাঁস দিয়ে। সুতরাং আজ রাত এগারোটায় দুলিকে যেতে হবে ঐ অভিশপ্ত অশথ গাছের

কাছে, এবং গাছের গায়ে নিজের নাম খোদাই করে আসতে হবে। কাল সকালে সুচরিতাদি-সমেত সব্বাই গিয়ে সেই প্রমাণ দেখে আসবে। তার পর দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত হবে দুঃসাহসী সঙ্ঘের সভ্যা।

সুচরিতাদির মুখে কথাগুলো শুনতে শুনতে দুলির বুকটা যে দু-একবার ছ্যাঁত করে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু সহজে পরাজয় মেনে নেবার পাত্রী ও নয়। সুতরাং বুক ফুলিয়ে তেজীয়ান সুরে ও বলে উঠেছে, "আমি ঠিক পারব, সুচরিতাদি! আমি ওখানে গিয়ে চুলের কাঁটা দিয়ে গাছের গায়ে ডি-অক্ষরটা লিখে দিয়ে আসব, তুমি দেখো।"

"তাহলে তক্ষুনি তোমাকে আমরা মেম্বার করে নেব," সুচরিতাদি বললেন।

শমিতা চাপা গলায় ওকে সাহস দিল, তারপর ওরা বেরিয়ে এল মিটিং ছেড়ে।

কিন্তু দুলির সামনে এখন দুটো সমস্যা। এক, রাত এগারোটায় নিজের ঘর ছেড়ে বের হওয়া; দুই, মিসেস হুবার্ডকে ফাঁকি দেওয়া। কারণ, রাত দশটা নাগাদ তিনি প্রত্যেকের ঘরের দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরে গুড নাইট জানিয়ে যান, এবং স্বচক্ষে দেখে যান, সকলে যার-যার ঘরে শুয়ে আছে কি না। নিয়মশৃঙ্খলার এতটুকু এদিক-ওদিক তিনি একেবারে বরদাস্ত করেন না।

প্রথম সমস্যার সমাধান করল শমিতা। সেই দুলিকে শিখিয়ে দিলো কীভাবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বাইরে বেরোতে হবে। আর দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করল দুলি নিজেই।

ঠিক রাত দশটায় দুলির ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হল এবং মিসেস হুবার্ডের ছায়া-ছায়া মুখটা দেখা গেল। বিছানায় শোয়া ছোট্ট শরীরটাকে লক্ষ করে চাপা স্বরে উনি বললেন, "গুড নাইট, দোলনচাঁপা।" দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের এক অন্ধকার কোণ থেকে দুলি বেরিয়ে এল। বিছানার কাছে এসে চাদর-ঢাকা জিনিসটার ওপর আদুরে হাত বোলাল। খুব জোর বোকা বানানো গেছে মিসেস হুবার্ডকে। অন্ধকার ঘরে জানলা দিয়ে বিছানার ওপর এসে পড়েছে এক ফালি চাঁদের আলো। সেই আলোছায়ায় চাদর-ঢাকা শোয়ানো পাশ-বালিশটাকে দুলি বলে ভুল করেছেন মিসেস হুবার্ড। দুলির আর তর সইল না। একটা চুলের কাঁটা কোমরে গুঁজে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। এই লোহার কাঁটাটা ওকে ভূতের ভয় থেকে বাঁচাবে।

একটু আগেই ঝমঝম করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আকাশ ঝক-ঝকে পরিষ্কার, দেখা যাচ্ছে গোল থালার মতো চাঁদ। ঘাসে ছাওয়া ভিজে মাটির ওপরে ছোট্ট-ছোট্ট পা ফেলে ছুট লাগাল দুলি। অশথ গাছটা এখান থেকে দূর কম নয়। সুতরাং একটু গা ছম-ছম করলেও ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৌড়ে চলা নিজের লম্বা ছায়াটাকে দেখে অনেকটা ভরসা পেল দুলি। ওর চার-পাশে শুধু ভিজে মাটি, ঠান্ডা বাতাস ও অন্ধকার রাত।

এক সময় দুলির চোখে পড়ল ঝুপসি অশথ গাছটা। চোখ কান বুজে চুলের কাঁটা বাগিয়ে ধরে গাছের গোড়ায় এগিয়ে গেল দুলি। একবার ওপরে তাকাল। কোন্ ডালটায় গলায় দড়ি বেঁধে দিয়ে ঝুলেছিল আয়ি? হঠাৎই ও শুনতে পেল রাত-জাগা একটা পাখির কর্কশ চিৎকার। ভয়ে ওর বুকটা যেন ঠান্ডা হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে গাছের গুঁড়িতে কোনোরকমে ডি অক্ষরটা লিখে দুলি ছুটে চলল বোর্ডিংয়ের দিকে। চুলের কাঁটাটা কোথায় যে পড়ে গেল ওর আর খেয়াল রইল না। জল-কাদা ডিঙিয়ে ছুটে চলল দুলি। এত ব্যস্ত না হলে হয়ত ওর নজরে পড়ত, ভরসা দেবার জন্যে ওর লম্বা ছায়াটা এখন আর ওর সঙ্গে নেই। কোথায় চলে গেছে কে জানে!

নিজের ঘরে ফিরে ঢিপঢিপে বুকে আস্তে করে দরজা ফাঁক করল দুলি। নাঃ, সব কিছু একইরকম আছে। চাঁদের সাদা আলো, চাদর-ঢাকা পাশবালিশ—সব। দুলি যে এতক্ষণ ঘর-ছাড়া ছিল সেটা কেউ তাহলে টের পায়নি! ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ও। তারপর বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শোবার জন্যে পাশবালিশের ওপর থেকে চাদরটা সরাতে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে দুলির মনে হল, চাদরের তলা থেকে যদি বেরিয়ে আসে শীর্ণ, জিরজিরে একটা হাত? আর ভাবতে পারল না দুলি। ঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

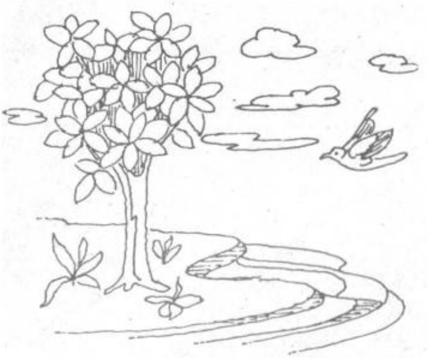

পথ-চাওয়া

চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

বলেছিল পুলুমাসি,
চল টুলু, ঘুরে আসি
আমরা দুজন
এই দিন তিন-চার
ডায়মণ্ড হারবার
সুন্দরবন।
আকাশ যেখানে নেমে
নদী-বনে আছে থেমে
চুপ একলাটি,
বাতাস যেখানে হাসে
ঘাস, জল ভালবাসে,
কথা কয় মাটি।
হাতছানি দিয়ে ডাকে
অচেনা নদীর বাঁকে
বুনোফুল, লতা।
কোথাও পাখির সুর
কোথাও বা সুমধুর
গাঢ় নীরবতা।
জানি না, হয়নি যাওয়া
আজ শুধু পথ-চাওয়া
শুধু দিন গোনা,
আচ্ছা, বলো তো আগে
কার আর ভাল লাগে
শুধু পড়াশোনা?

বহুদর্শী

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

কে বলে দেখিনি হিমালয় আমি
দেখিনি পামির ছাদ,
দেখি মিশরের পিরামিড আমি
দেখি আসোয়ান বাঁধ।
কাশ্মীর আমি দেখি বারবার
দেখি আমাজন-নদ
দেখি উগান্ডা, হনলুলু আর
দেখি বৈকাল-হ্রদ।
হাওড়া ব্রিজ তো বাড়ির দুয়ারে
সকাল-সন্ধ্যা দেখি,
মমিও দেখেছি পিরামিড খুঁড়ে
আহা, বিস্ময় সে কী!
গির-অরণ্যে সিংহ দেখেছি,
বাঘ সুন্দরবনে,
সব দেখা নয় চর্মচক্ষে
কিছু দেখা ঘটে মনে।

ছবি রতন সেন

আমার স্বপ্ন

শমীন্দ্র ভৌমিক

আঁধার হলে গাঢ়
থমথমিয়ে অমনি ওঠে
সাঁতরাদিঘির পাড়ও!
একলা বসে আছি—
দিঘির পাড়ে গাছের ছায়া
করছে নাচানাচি।
জোনাক আলো ছড়ায়
ঝুর ঝুর ঝুর শব্দে বাতাস
গাছের পাতা ঝরায়।
ছলাত ছলাত ছল
লম্ফ-ঝম্ফ দিচ্ছে মাছে
উথাল-পাথাল জল।
মা ডাকছেন, বাপি,
সন্ধে হতেই ঘুমে ঢুলিস
দিনে লাফালাফি!
চোখ খুলেছি যেই,
পড়ার টেবিল, বই ছড়ানো,
স্বপ্ন তো আর নেই!

ছবি রতন সেন

মণিমেলার খবর

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার পথে দেখা গেল সাদা পোশাকের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গলায় নীল বর্ডারের স্কার্ফ বেঁধে, হাতের বাক্স পথচারীদের সামনে এগিয়ে ধরছে। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সাহায্য দিচ্ছেন। বিনিময়ে 'মণি' আঁকা ছোট্ট সবুজ পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের বুকে। ছোটদের এমন সংগ্রহ অভিযান দেখা যায় কেবল মণিমেলা পতাকা দিবসে। বিদ্যালয়, অফিস, রেল স্টেশন এবং পথে পথে মণি-মেলার ছোট সভ্যরা সাহায্য সংগ্রহে বার হয়ে-ছিল। এই একটি দিনের সংগ্রহ থেকে সারা বছর মণিমেলার কিশোর- ও শিশু-কল্যাণের কাজ চলবে।

রবীন্দ্র-সরোবরের সবুজ মাঠ ভরে ওঠে শিশু শিল্পীদের ভিড়ে। প্রত্যেকের হাতে রঙের বাক্স, আঁকার বোর্ড, জলের পাত্র। মণি-মেলা মহাকেন্দ্রের বসে-আঁকো প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে মণিমেলা ও বিভিন্ন প্রতি-ষ্ঠানের বহু ছেলেমেয়ে অংশ নেয়। প্রতি-যোগিতার আগে আঁকার বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়। ছোট শিল্পীরা সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে তাক লাগিয়ে দেয় সকলকে।

জেলা সংবাদ

বর্ধমান জেলার সতেরোটি মণিমেলার তিন শতাধিক মণিভাই-বোন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতি-যোগিতায় অংশ নেয়। মহামায়া মণিমেলার সনৎ সেন এবং আনন্দ মণিমেলার সুনীতি দাস ভাই ও বোনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী এবং দলগতভাবে আনন্দ মণিমেলা শ্রেষ্ঠ দল বিবেচিত হয়।

মণি সন্দেশ

নেতাজী জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করে বিধান, মুকুল, অনিন্দিতা ও অন্যান্য মণিমেলা।

অনিন্দিতা মণিমেলার নবম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন 'মৌমাছি'। নিউ তরুণ মণিমেলার শতাধিক ভাইবোন শীতের বনভোজনে জামসেদপুরের কাছে একটি মনোরম স্থানে সারাদিন কাটিয়ে আসে। অনিন্দিতা মণিমেলার দু-দিনের দীর্ঘ ভ্রমণ উপভোগ্য হয়।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

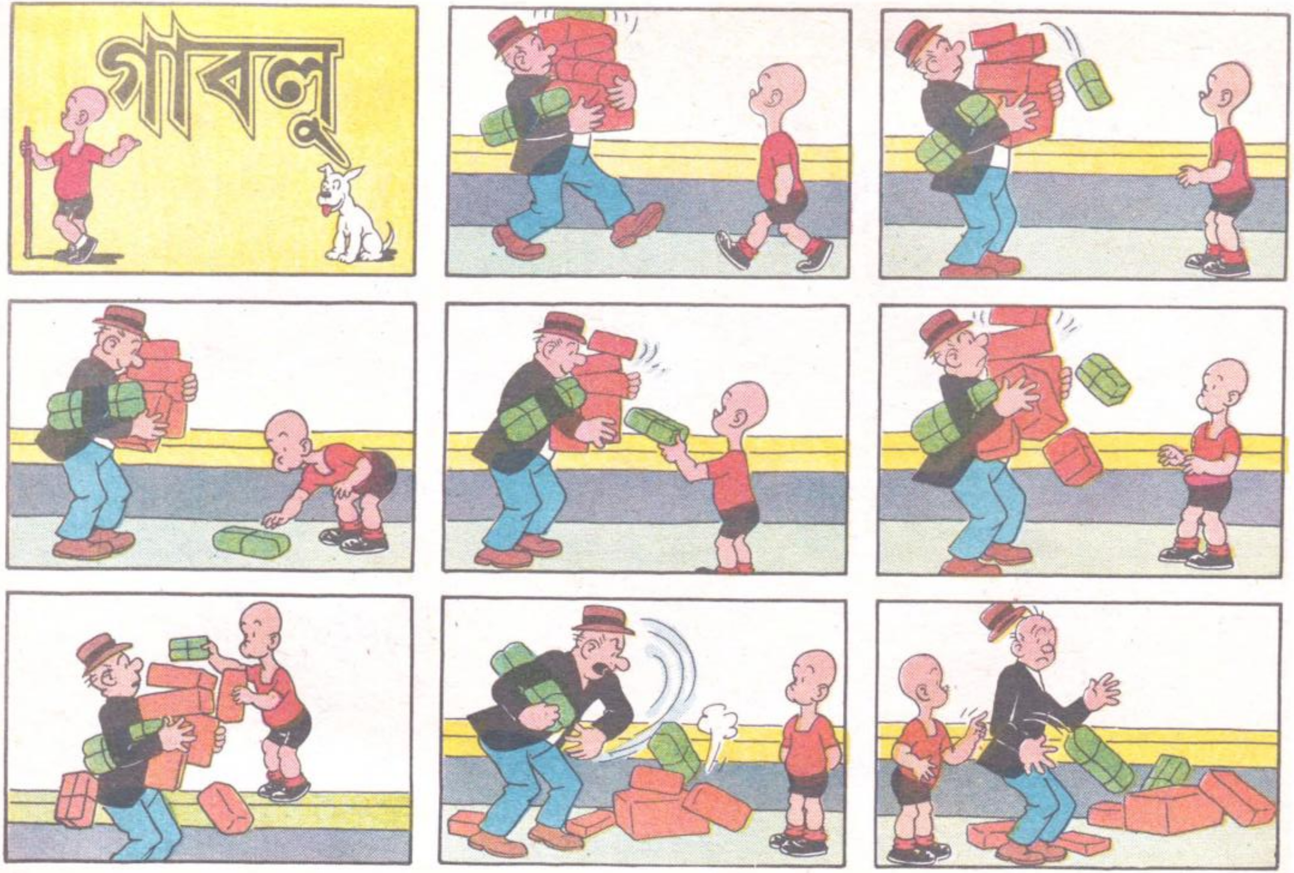
গাবলু

চামেলিকে নিয়ে

প্রসাদ

আগের দিন চামেলি যখন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এল, তখন তাকে আমরা খুব ব্যস্ত দেখেছিলাম:

Chameli got off the bus.

She ran up the steps to the front door.

সকালে যখন সে ইস্কুলে যায়, তখন কী দেখি?

Chameli runs down the steps.

She gets on the bus.

তারপর জামা-কাপড়ের ব্যাপারটা দ্যাখো:

Chameli puts her school dress on in the morning.

She takes it off in the afternoon.

আরও দ্যাখো:

Look at Chameli.

She has her new dress on.

She looks very pretty in her new dress.

She has come back from the party.

But she still has her party-dress on.

Mother asks her to take it off.

"Oh, Mummy," she says, "may I keep it on?"

খানিকক্ষণ পরে:

Has Chameli taken her party-dress off?

No, she still has it on.

এই জামাটা যেদিন কেনা হয়েছিল, সেদিন:

Mother took Chameli to the dress-makers.

They saw many nice dresses.

Chameli tried some of them on.

She liked this one best.

She had a very happy smile on her face when she came out of the shop with her new dress.

তারপর দ্যাখো:

Father winds up the clock.

It has run down and stopped.

It has to be wound up once every week.

Father has to stand on a chair to wind it up.

Once Chameli thought she would wind it up.

She got on a chair and tried to reach up to the clock.

Unfortunately, she lost her balance and fell off the chair.

She cut her forehead.

It was a bad cut.

The doctor had to be called in as Father was away.

He had to stitch it up.

সেই দিনই আবার দ্যাখো কী কাণ্ড:

This had happened in the morning.

Chameli had to take a day off from her school.

But in the afternoon she was running about the house as if nothing had happened.

Her friend Jaymala called on her in the evening to see why she hadn't been to school.

They switched off the lights in a room and started playing hide and seek.

Chameli stubbed her toe against a chair and cried out in pain.

হিগিনকাকু

বাচস্পতি

গোলাপি বেড়ালছানার মতো ছোট্ট একটা বোন হয়েছে দশ বছরের ভন্টুর, নাম ঠিক হয়েছে তিন্নি। তিন্নি খিদে পেলে মিউ মিউ করে কাঁদে আর পেট ভরলেই ঘুমিয়ে পড়ে ফুরফুর করে নাক ডাকাতে থাকে।

রোববার সকালে হৈ-হৈ করে হিগিনকাকু এসে হাজির। কাঁধে টেপ-রেকর্ডার, মাইক্রোফোনের মাউথ-পীসটা তিন্নির মুখে ঠেকিয়ে বললেন, "একটু কাঁদ তো রে মা, টেপ করে নিই।"

বাবার এই পিসতুতো ভাইয়ের হিগিন নামটা পৈতৃক নয়। পেশায় ভাষাবিজ্ঞানী বলে বার্নার্ড শ-র 'পিগমেলিয়ন' নাটকের প্রফেসর হিগিনস নামে ভন্টুর বাবাই তাঁকে ডাকেন। সেটাই দাঁড়িয়েছে হিগিন। চুয়াল্লিশেই হিগিন একটি উজ্জ্বল টাক মোলায়েম ভুঁড়ি আর ভারী ফ্রেমের মোটা লেন্সের চশমা বাগিয়ে ফেলেছেন। আর ভাষা-বিজ্ঞান চর্চা করে আর পড়িয়ে মাথায় খানিকটা ছিটও গজিয়েছে বলে সকলের ধারণা। ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি বোধহয় টাকের দিক থেকে লোকের নজর সরিয়ে দেবার কৌশল।

"তা এত যন্তর-তন্তর কেন রে হিগিন?" ভন্টুর বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

হিগিনকাকু বললেন, "ব্যাপার আছে। তিন্নির বয়েস কত হল যেন?"

বাবা গুনে জানালেন, "উনিশ দিন।"

রহস্যময় মুখে হিগিনকাকু বললেন 'শোনো বড়দা, এবার তিন্নি মুখে নানারকম আওয়াজ করতে শুরু করবে। ইংরেজিতে যেসব আওয়াজকে বলে "কুয়িং" (cooing) "ব্যাবলিং" (babbling)। এর থেকে তিন্নির কথা ফোটা পর্যন্ত সব আমি একটানা রেকর্ড করে রাখতে চাই। বৌদিকে দেখিয়ে দিচ্ছি। টেপ উনিই করবেন। এটা নতুন রিসার্চ আমার। বাচ্চাদের কথা-শেখা একটা যা-তা মজার কান্ড।"

কাজের মেয়ে রাধা এসে হিগিনকাকুর প্রিয় কালো কফি এনে টেবিলে রাখতেই আবার ফস করে মাউথ-পীসটা তার মুখের সামনে বাড়িয়ে বললেন, "ও আধাদিদি, আত্তিরবেলা আমযাত্রা দেখতে যাবি নে?"

রাধা মুখে আঁচল চেপে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হিগিনকাকু ভন্টুর পিঠে সের দশেক ওজনের একটি থাপ্পড় বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, ভাষাবিজ্ঞানী হবি?"

ভন্টু ভয়ে-ভয়ে বলল, "অনেক ভাষা শিখতে হবে নাকি?"

"নিয়েৎ নিয়েৎ!" বাংলায় তেমন জোর আসে না বলে এবার রাশিয়ান ভাষায় "না-না" বলে উঠলেন হিগিনকাকু। তারপর বললেন, "লেকিন ইয়ে বাত সহী হ্যায় কি—দু-চারটে ভাষা জানলে কাজের সুবিধে হবে।"

ভন্টু বাবার কাছে আবদার ধরল, "হ্যাঁ বাবা, আমি ভাষাবিজ্ঞানী হব, টেপ-রেকর্ডার চালাব।"

বাবার হাসিকে থমকে দিয়ে হিগিনকাকু লাফিয়ে উঠে বললেন, "উত্তম! তাহলে শিখে নাও কী করে ফরাসি ভাষার ইউ (u) উচ্চারণ করবে। ঠোঁট দুটো গোল আর ছুঁচোলো করো, যেন উ বলবে। করেছ? এবার ঐ ঠোঁটেই জোরে ঈ-ঈ উচ্চারণ করো। একটু তেড়েফুঁড়ে করতে হবে বাবা।" বলে নিজেই বুঈঈ করে এমন একটা আওয়াজ হাঁকড়ালেন যে...

তাঁর মুখের সামনে উড়তে থাকা একটা লোভী মশা ঐ বুঈঈ-র প্রলয়ংকর ঝাপটায় শূন্যে ছিটকে, গন্ডাচারেক ডিগবাজি খেয়ে, আর্তনাদ করে, ভবলীলা সাঙ্গ করল।

ও ঘরে তিন্নি কেঁদে উঠল। (ক্রমশ)

বাঘা

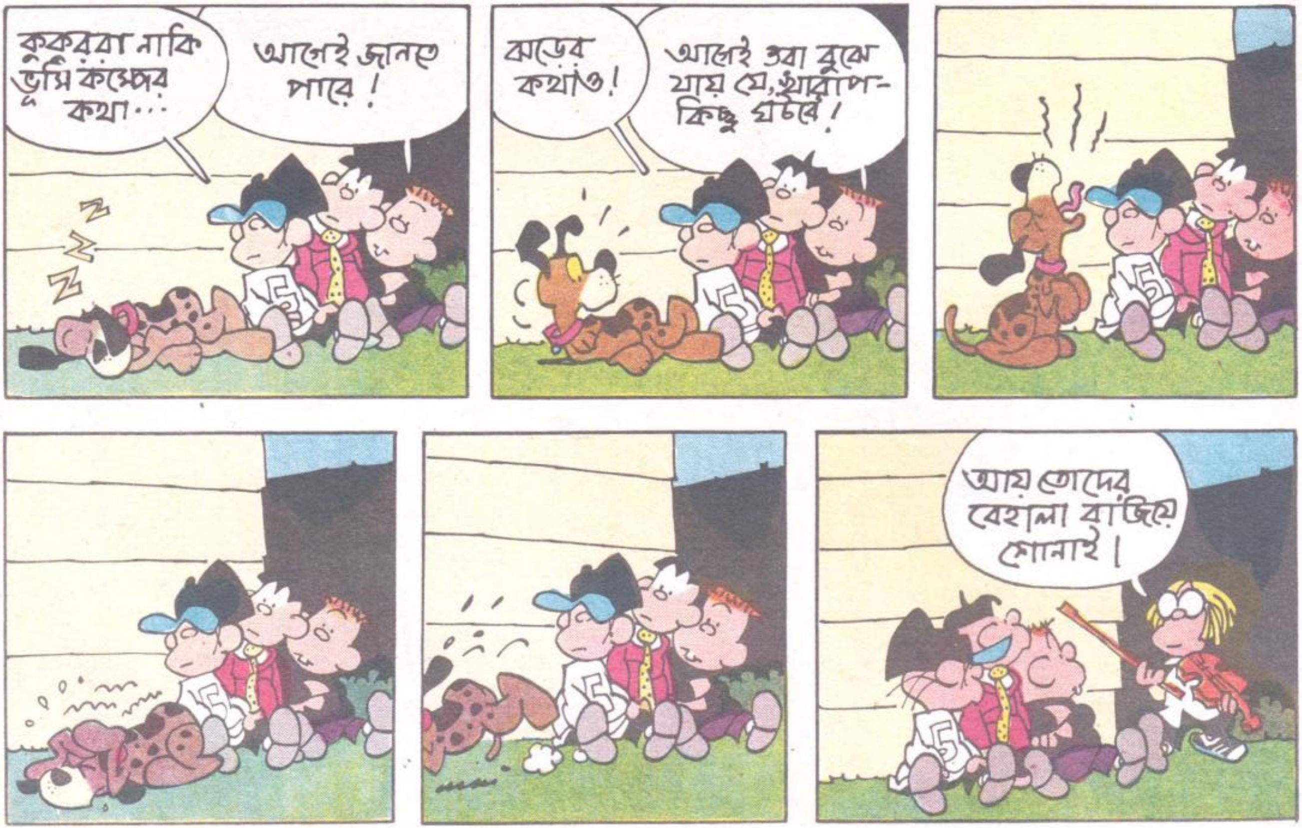
কুকুররা নাকি ভূমিকম্পের কথা...
আগেই জানতে পারে!
ঝড়ের কথাও!
আগেই ওরা বুঝে যায় যে, খারাপ-কিছু ঘটবে!
আয় তোদের বেহালা বাজিয়ে শোনাই।

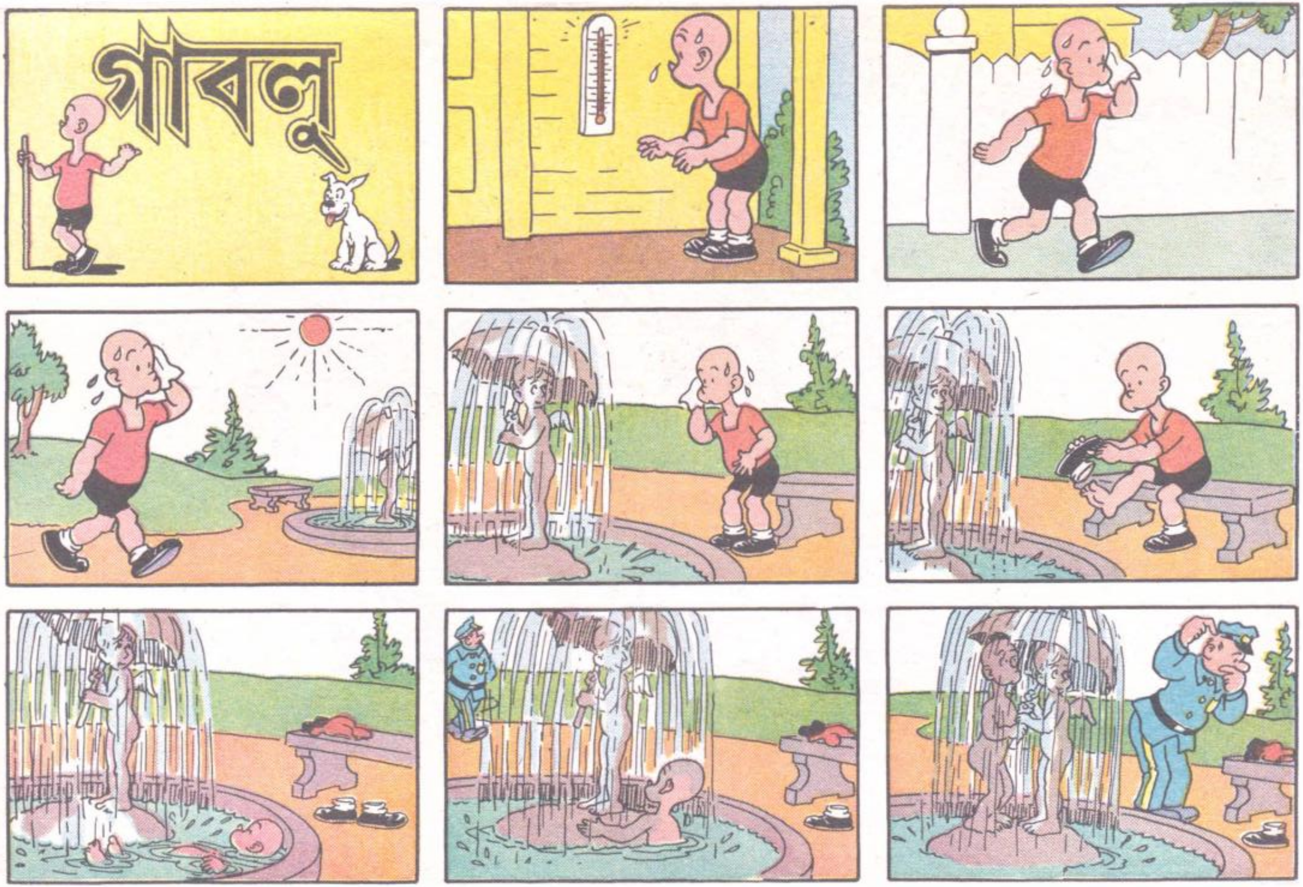
গাবলু

ডিম থেকে পাখি

ডিমের আকার থেকে কেমনভাবে পাখি তার সত্যিকারের রূপ পাচ্ছে। একটু নজর দিয়ে নমুনাটি দেখলেই বুঝতে আটকাবে না কোথাও। দেখার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা শুরু করে দাও।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

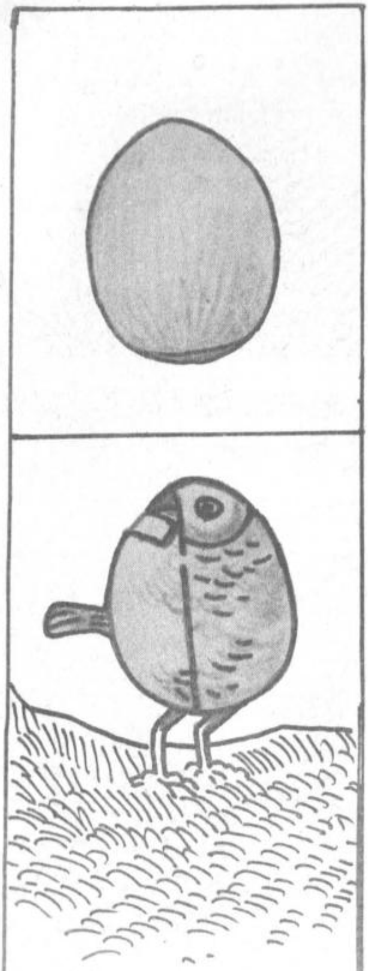

কাগজের ঝোলনা-৩

আগের বারের খ আর খ—২ নকশা-মাফিক আমরা কাজ এগিয়ে রেখেছি। এবার গোল আকারের মধ্যে যে অংশটুকু কেটে রেখেছি সেই আলাদা-হয়ে-যাওয়া এক-একটি অংশকে দুই দিকের শেষ দিক ধরে (ক—ক ছবি) গোলভাবে জুড়ে দিলেই ঠোঙার মতো আকার নেবে (২ নং ছবি)। ২ নং নকশায় যেমন ভাবে ৪-এর ওপর ৫ পড়েছে, এমন ভাবে প্রত্যেক অংশকে (৬, ৭, ৮, ৯ অংশ) জুড়ে নিলেই ঝোলনার জন্য তৈরি হবে প্রথম পাপড়ি।

জেনে রাখো—(১) প্রত্যেক অংশ মোড়ার পর পাতলা আঠা দিয়ে জুড়ে নাও। (২) এগুলি হতে থাকলে আলাদা আলাদাভাবে রাখবে। একসঙ্গে রাখলে জড়িয়ে যাবার ভয় আছে।

কারিগর

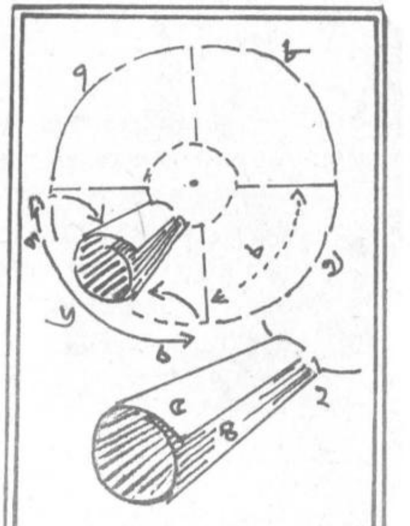

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে...

এমন, যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা! তাই তো, বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন। লিনটাস-SU-224-1810 BG

Reg No WB/CC/264. MH-BY-SOUTH 683 ANANDAMELA 22 April 1981